দিল্লীশ্বরী

মোহাম্মদ সানাউল্লাহ্, এম্, এ,

[দাম ১।০ মাত্র

প্রকাশক

আবুল ফয়েজ এণ্ড কোং
১৬নং হায়াত খাঁ লেন
কলিকাতা।

বৈশাখ, ১৩৪২ সাল
১ম সংস্করণ

Printed by
S. C. Das Gupta,
Sulekha Press, 5, Musalmanpara Lane
Calcutta.

সোলতানা রাজিয়া	...	১
চাঁদ সোলতানা ...	...	৪৭
নূরজাহান ...	...	১০৮
মমতাজমহল ...	...	১৭৫

সোলতানা রাজিয়া

সোলতানা রাজিয়া

—এক—

মুসলমান মেয়েদের মধ্যে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে যাঁরা বোসেছেন এবং সাম্রাজ্য শাসনে ও প্রজারঞ্জনে দক্ষতা দেখিয়ে ইতিহাসের পাতায় অমরত্ব লাভ কোরেছেন, সোলতানা রাজিয়া তাঁদের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান স্থান অধিকার কোরে আছেন। এখানে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে তাঁর পূর্ব্বপুরুষের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া দরকার।

সোলতানা রাজিয়া, সোলতান শামসুদ্দীন আল্‌তামাশের বড় মেয়ে ছিলেন। তিনি যে বংশে

জোন্মেছিলেন, সে বংশ ইতিহাসে দাস বংশ নামে অভিহিত হোয়ে আস্‌ছে। এর কারণ তাঁর মাতামহ কুতুবউদ্দীন এবং পিতা আল্‌তামাশ উভয়েই প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। পরে দুজনেই শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার গুণে ভারতের সিংহাসনের অধিকারী হোয়েছিলেন।

সোলতানা রাজিয়ার মা ছিলেন কুতুবুদ্দীন আইবকের মেজ মেয়ে। তিনি নানা গুণগ্রামের অধিকারিণী ছিলেন। তবে ধর্ম্মপ্রাণতা এবং তেজস্বিতার জন্যই তিনি বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ কোরেছিলেন। তাঁরই শিক্ষায় এবং যত্নে ছেলে বেলা থেকেই রাজিয়া গোড়ে উঠেছিলেন। মা, প্রাণপণ যত্নে মেয়েকে আদর্শ মেয়ে রূপে শিক্ষিত কোরে তুল্‌তে চেয়েছিলেন, তাকে নিজের সকল গুণপণার অধিকারী কোর্‌তে চেয়েছিলেন এবং সেজন্য তাঁর যত্ন ও চেষ্টার অবধি ছিলনা।

ছেলে বেলায় হাতেখড়ির সঙ্গে সঙ্গে রাজিয়া আরবী ও ফার্সী ভাষা শিখ্‌তে আরম্ভ করেন এবং

অল্পদিনের ভিতরেই উভয় ভাষাতে বিশেষ পারদর্শী হোয়ে উঠেন। তাঁর উচ্চারণ অতি বিশুদ্ধ এবং কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মিষ্ট ছিল। তিনি যখন কোরাণ পাঠ কোর্‌তেন, তখন মন্ত্রমুগ্ধের মত লোকে তা শুন্‌তো। তেমন সুস্পষ্ট শুদ্ধ উচ্চারণ, মধুর স্বর-ভঙ্গিমা তার আগে কেউ কোন দিন শোনেনি। কিশোর বয়সেই রাজিয়ার কোরাণ-পাঠের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পোড়েছিল। অনেক বড় বড় আলেম ও হাফেজ আগ্রহ কোরে বালিকা রাজিয়ার কোরাণ পড়া শুন্‌তে আস্‌তেন এবং শুনে শত মুখে তার প্রশংসা কোর্‌তেন।

রাজিয়ার বুদ্ধি এবং স্মরণশক্তিও অতীব তীক্ষ্ণ ছিল। অত্যন্ত দুরূহ এবং জটিল ব্যাপারও তিনি অতি সহজেই বুঝে নিতে পার্‌তেন, এবং কোন কথা একবার শুন্‌লে বা পোড়্‌লে জীবনে তা ভুল্‌তেন না। অতি ছেলে-বেলায় যে সমস্ত ফার্সী কবিতা তিনি পোড়েছিলেন, বড় হোয়েও—এমনকি সাম্রাজ্য শাসনের গুরুতর কর্ত্তব্যের চাপে পোড়েও

তার একবর্ণও তিনি ভুলে যাননি, তখনও তিনি অনর্গল এবং অবিকল সে সব কবিতা আবৃত্তি কোরে যেতেন।

কিন্তু সবের উপরে ছিল তাঁর রূপ। যে কেউই তাঁকে দেখ্‌তো, সেইই মুগ্ধ হোয়ে যেত। শতমুখে প্রশংসা না কোরে পারতো না। বাস্তবিকই সে রূপের তুলনা ছিল না।

সোলতান আলতামাশ মেয়ের এই অসাধারণ রূপ গুণ দেখে তার প্রতি অতি মাত্রায় আকৃষ্ট হোয়ে পোড়েছিলেন। এবং তাকে মনের মত কোরে গোড়ে তোলবার জন্য যা-কিছু করা দরকার সবই কোরেছিলেন।

একটু বয়স হোলেই তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে বেরুতে আরম্ভ কোরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প রাজকার্য্যও শিক্ষা দিতে লাগ্‌লেন। লেখা পড়ায় রাজিয়া'র যে প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, রাজনীতিতেও ঠিক তেমনি পাওয়া যেতে লাগ্‌লো। দেখে

সোলতান আলতামাশের আনন্দের সীমা রইল না। মেয়েকে রাজনীতিতে সুপণ্ডিত কোরে তোলবার জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন কোরতে লাগলেন।

রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা মেয়ের প্রতি সোলতানের এই পক্ষপাতিতা দেখে বেশ বুঝে নিলেন যে, তিনি মেয়েকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কোরে যাবেন। কাজেই তাঁরাও রাজিয়ার প্রতি মনে মনে একটা সশ্রদ্ধ স্নেহ পোষণ কোর্তে লাগ্লেন।

আসল কথা—সোলতান আলতামাশের ছেলেরা সকলেই বিলাসী এবং অকর্ম্মণ্য ছিলেন। রাজ্য শাসন বা পরিচালনার ক্ষমতা তাঁদের কারুরই ছিল না। সোলতানের মনে মনে আশঙ্কা হোয়েছিল, উপযুক্ত পুত্রের অভাবে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সাধের সাম্রাজ্য তাসের প্রাসাদের মত ভেঙে পোড়্বে। তাই পুত্রদের বাদ দিয়ে তিনি কন্যার উপরেই নির্ভর কোরেছিলেন বেশী।

রাজকুমারী রাজিয়া যখন যৌবনে পদার্পণ করেন, সেই সময় সোলতান আলতামাশ গোয়ালিয়র অবরোধ করবার জন্য অভিযান করেন। রাজধানী পরিত্যাগের সময় তিনি ছেলেদের বাদ দিয়ে কন্যা রাজিয়াকেই তাঁর স্থলাভিষিক্ত কোরে যান। যতদিন পর্য্যন্ত তিনি ফিরে না আসেন, ততদিন পর্য্যন্ত রাজিয়া তাঁর নামে রাজ্য শাসন কোরবেন, উজীর ও আমীর ওমরাদের ডেকে তিনি এই নির্দ্দেশ দিয়ে যান। তাঁর এই ব্যবস্থার কথা শুনে একজন আমীর জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, ছেলেরা বর্ত্তমান থাক্‌তে মেয়ের উপর রাজ্যশাসনের ভার দিলেন কেন? উত্তরে সোলতান বোলেছিলেন, রাজিয়া মেয়ে হোলেও তার পুরুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয় আছে এবং বিশটা রাজপুত্রের ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা এক কোর্‌লেও তার ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার সমান হবে না।

সোলতানের এই কথাতেই বোঝা যায়, তিনি রাজিয়াকে কতখানি বিশ্বাস এবং তার উপর কতখানি নির্ভর কোরতেন।

সোলতানের অবর্ত্তমানে রাজিয়া এমন ভাবে শাসন কার্য্য চালাতে লাগ্‌লেন, যা দেখে রাজ্যের বড় বড় মাথাওয়ালা আমীর ওমরা পর্য্যন্ত অবাক হোয়ে গেল। একটা অল্পবয়স্কা মেয়ে এমন দক্ষতার সঙ্গে এতবড় গুরুতর কাজ চালিয়ে যেতে পারে, এটা কেউ কোন দিন কল্পনাও কোর্‌তে পারেনি।

এই ঘটনায় রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিরা অনেকেই রাজিয়ার পক্ষপাতী হোয়ে পোড়্‌লেন। এবং অদূর ভবিষ্যতে দিল্লীর সিংহাসন যে তাঁরই অধি-কারে আস্‌বে, মনে মনে এ বিশ্বাসও পোষণ কোরতে লাগলেন।

—দুই—

সোলতান আল্‌তামাশের যখন মৃত্যু হোল, তাঁর বড় ছেলে রুকুনউদ্দীন ফিরোজ তখন দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। আমীর ওমরাদের মনে মনে ধারণা ছিল, সোলতানের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে একটা বিরোধের সূত্রপাত হবে। কারণ, অন্তরে অন্তরে রাজিয়া সিংহাসন লাভের আশা পোষণ করেন। তার উপর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে তাঁর পক্ষে আছেন, একথাও তিনি খুব ভাল কোরে জানেন; কাজেই ভাইএর বিরোধিতা করা তাঁর পক্ষে এক রকম স্বাভাবিক।

কিন্তু অমাত্যদের এ-ধারণা শেষ পর্য্যন্ত ধারণাই রোয়ে গেল। কাজে পরিণত হোল না। ভাইএর সিংহাসনে বস্‌বার পথে রাজিয়া কোন বাধাই সৃষ্টি কোরলেন না। অমাত্যেরা যখন দেখ্‌লেন, যার প্রয়োজন, সে-ই চুপ-চাপ, তখন তাঁরা আর উপর-পড়া হোয়ে গণ্ডগোলের সৃষ্টি কোর্‌তে যান কেন? তাঁরাও চুপ হোয়ে গেলেন। রুকুনউদ্দীন ফিরোজ নির্ব্বিবাদে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার কোরে বোস্‌লেন।

কিন্তু এই নূতন সোলতান অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল বিলাসী ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন। সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা আরও বেড়ে গেল। নিজের মায়ের উপর সকল কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত মনে স্ফূর্ত্তির সাগরে গা' ভাসিয়ে দিলেন। রাজ্যের শাসন বা পরিচালনার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখলেন না।

তাঁর মা ছিলেন একজন তুর্কী ক্রীতদাসী। হিংসা ও নিষ্ঠুরতায় সে-সময়ে সারা হিন্দুস্থানে

তাঁর জোড়া মিল্‌তো না। হাতে ক্ষমতা পেয়ে তিনি যা' আরম্ভ কোর্‌লেন, তা' দেখে সমস্ত দেশ আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লো। সোলতান আলতামাশের হেরেমে বেগম থেকে বাঁদী পর্য্যন্ত যত স্ত্রীলোক ছিল, প্রত্যেককেই তিনি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা কোরলেন। কিন্তু এত কোরেও তাঁর হিংসা-বৃত্তির শান্তি হোল না। শেষ পর্য্যন্ত মরহুম সোলতানের ছোট ছেলে কুতুবউদ্দীনকেও তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় দিলেন।

এই ঘটনায় আমীর ওমরা উজীর সকলেই ঘোর অসন্তুষ্ট হোয়ে উঠ্‌লেন। সোলতান রুকুন-উদ্দীনের অপর ভাই গিয়াসউদ্দীন মহম্মদ সে সময় অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌লেন এবং বাংলা থেকে যে রাজস্ব দিল্লীতে আস্‌ছিল, পথের মাঝে তা দখল কোরে নিজেকে সোলতান বোলে ঘোষণা কোরলেন। সঙ্গে সঙ্গে বদাউন, লাহোর, মুলতান ঝাঁসি প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্ত্তারাও একযোগে

প্রকাশ্য বিদ্রোহ উপস্থিত কোরলেন। সমগ্র দেশে অশান্তির আগুন ধূ ধূ কোরে জ্বোলে উঠ্লো।

সোলতান রুকুনউদ্দীন আর চুপ কোরে থাক্তে পারলেন না, বিলাসের শয্যা ছেড়ে তাঁকে বেরিয়ে আস্তে হোল। সৈন্য সামন্ত নিয়ে তিনি বিদ্রোহ দমন কোর্তে চোল্লেন। কিন্তু যাদের সাহায্যে তিনি বিদ্রোহ দমন কোরবেন, তারা তাঁর উপর ঘোর অসন্তুষ্ট ছিল। তাই রাজধানী ছেড়ে বহুদূরে মনস্থুরপুরে গিয়ে যখন পৌঁছুলেন, তখন তাঁর দলের সাত জন প্রধান ব্যক্তি তাঁদের দলবল নিয়ে তাঁকে পরিত্যাগ কোরে দিল্লীর পথে ফিরে এলেন।

দিল্লীতে ফিরে এসেই তাঁরা শাহজাদী রাজিয়াকে হিন্দুস্থানের রাজদণ্ড গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। রাজিয়া আগে থেকেই সোলতান এবং তাঁর মায়ের ব্যবহারে বিশেষ অসন্তুষ্ট হোয়েছিলেন এবং তার প্রতিকারের উপায় খুঁজ-ছিলেন। এখন সুযোগ বুঝে অমাত্যদের সহায়তায় তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার কোরে বোস্লেন

এবং সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসী-প্রকৃতি রাজমাতাকে বন্দী কোরে শয়তানী নিষ্ঠুরতার অবসান কোরে দিলেন।

সোলতান রুকুনউদ্দীনের কাছে যখন এখবর পৌঁছুল, তখন বিদ্রোহ দমন বাদ দিয়ে তিনি সদলবলে রাজধানীর দিকে যাত্রা কোরলেন।

সোলতানা রাজিয়া এজন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। তাই রুকুনউদ্দীন কেলুকারিতে পৌঁছুতেই সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিয়ে তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। যুদ্ধ আরম্ভ হোল। রুকুনউদ্দীন সোলতানার প্রচণ্ড শক্তির কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হোলেন। সোলতানা তাঁকে বন্দী কোরে দিল্লীতে নিয়ে এলেন। কিছুদিন পরে সেই বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হোল। উপস্থিত সোলতানা রাজিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ রইল না। তিনি নিশ্চিন্তে সাম্রাজ্যের উন্নতি বিধানে মনোনিবেশ কোরলেন।

—তিন—

কিছুদিন পর্য্যন্ত সোলতানা রাজিয়া বেশ সুখে শান্তিতে রাজত্ব কোরলেন। এই সময় সাধারণ প্রজা থেকে আরম্ভ কোরে রাজ্যের প্রধান প্রধান আমীর ওমরা অমাত্য পর্য্যন্ত সকলেই তাঁর বিশেষ পক্ষপাতী হোয়ে উঠলো। এর কারণও ছিল যথেষ্ট। যে সমস্ত গুণ থাক্‌লে সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে রাজ্য শাসন ও পরিচালনা করা যায়, সোলতানা রাজিয়ার মধ্যে তার কোনটারই অভাব ছিলনা। ছেলেবেলা থেকে বাপের শিক্ষায় তিনি রাজ্য ও রাজনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষরূপে

শিক্ষিতা হোয়ে উঠেছিলেন। তার উপর তাঁর বুদ্ধি ও প্রতিভা ছিল অসাধারণ রকমের। হাতে কলমে শিক্ষার সঙ্গে সেই বুদ্ধি ও প্রতিভার সংযোগ হওয়াতে তাঁর কর্ম্ম-ক্ষমতা অসম্ভব রকমে বেড়ে উঠেছিল। অতি কূট রাজনৈতিক ব্যাপার—বড় বড় রাজনীতিকেরা রাত্রিদিন মাথা ঘামিয়েও যা বুঝে উঠ্‌তে পারতেন না, অতি সহজেই তিনি তা' বুঝে নিতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই দুরূহ সমস্যা সমূহের সমাধান কোর্‌তেন। দরবারের প্রধান ব্যক্তিগণের গতি-বিধির উপর সতর্ক লক্ষ্য রাখ্‌তেন, তাঁদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বা ধারণা পোষণ কোর্‌তেন, কোন বিষয়ে নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ কোর্‌তেন না, উপরন্তু সকল কাজেই নিজের দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের প্রমাণ দিতেন। এই সমস্ত কারণে তাঁর উপর সকলেরই আস্থা জন্মে গিয়েছিল এবং সেই কারণে অন্তরে অন্তরে সকলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কোর্‌তো।

এ ছাড়াও সোলতানার আরও অনেক গুণ ছিল। বিশাল হিন্দুস্থানের সম্রাজ্ঞী হোলেও নারী-সুলভ কোমলতা এবং স্নেহ-মমতায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ ছিল। রাজপুরের রাজকুমার-রাজকুমারী থেকে আরম্ভ কোরে বান্দা বাঁদী পর্য্যন্ত সকলেই সমান ভাবে তাঁর স্নেহ-মমতার অধিকারী ছিল। প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি স্নেহপূর্ণ সদয় ব্যবহার কোর্‌তেন। অনিবার্য্য কারণ না ঘোট্‌লে কখনও কারো মনে ব্যথা দিতেন না। তিনি যখন সিংহাসনে আরো-হণ করেন, তখন রাজ-অন্তঃপুর বা তার বাইরে সোলতান রুকুনউদ্দীনের পক্ষের যে দু'চার জন লোক ছিল, তারা তাঁর শত্রুতা কোরতে ত্রুটী করেনি। ষড়যন্ত্র কোরে তাঁকে সিংহাসন থেকে সরাবার জন্য তারা যথেষ্ট প্রয়াস পেয়েছিল, সমস্ত জান্‌তে পেরেও তিনি তাদের ক্ষমা কোরেছিলেন। উপরন্তু তাদের পূর্ব্বের সম্মান বা মর্য্যাদাও বজায় রেখেছিলেন। কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার কারো কিছু ছিল না।

কিন্তু একজন স্ত্রীলোকের এতখানি প্রতিপত্তি, এতখানি সুখ্যাতি জনকয়েক কুচক্রীর মনে রিষের আগুণ জ্বালিয়ে দিল। তারা সোলতানাকে সিংহাসন থেকে সরাবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ কোরে দিল। এই সমস্ত যড়যন্ত্রীর মধ্যে উজীর নিজাম উল্ মুল্‌ক্ জুনায়দী, মালিক আলাউদ্দীন শের খানি, মালিক সইফ উদ্দীন কুচী, মালিক আয়েজ উদ্দীন সালার এবং মালিক কবির খান প্রধান। তাঁরা ষড়যন্ত্র কোরে তাঁদের সমস্ত শক্তি লাহোরে সঙ্ঘবদ্ধ কোর্‌লেন। তার পর সেখান থেকে দিল্লীর পথে রওয়ানা হোলেন।

অযোধ্যার জায়গীরদার মালিক নাসির যখন এই ষড়যন্ত্রের এবং অভিযানের কথা শুন্‌লেন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে ষড়যন্ত্রীদের বাধা দেবার জন্য অগ্রসর হোলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ গঙ্গা অতিক্রমকালে অতর্কিতভাবে শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হোয়ে তিনি পরাজিত এবং বন্দী হন। পরে সেই বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সোলতানার কাণেও এখবর পৌঁছুল। তিনিও চুপ কোরে ছিলেন না। তবে কৌশলে কাজ উদ্ধারের চেষ্টায় ছিলেন। আগেই বোলেছি, কূট রাজনীতিতে তিনি বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। সে সময়ে সমগ্র হিন্দুস্থানে এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। তিনি ষড়যন্ত্রীদের পরস্পরের ভিতর মনোমালিন্য সৃষ্টি করবার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ কোরলেন। এবং এমন কৌশলে কাজ কোরে যেতে লাগ্‌লেন যে, ষড়যন্ত্রীরা ঘুণাক্ষরেও তাঁর অভিসন্ধি বুঝ্‌তে পার্‌লো না। তাদের নিজেদের মধ্যে ঘোরতর মনোবাদ আরম্ভ হোল। কেউ কারো কথাতে বা সিদ্ধান্তে সম্মতি দিতে পারলো না। ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই তারা পরস্পরে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে পোড়্‌লো এবং যে যার দলবল নিয়ে নিজের নিজের কর্ম্মস্থলের পথ ধোর্‌লো।

সোলতানা যা চাইছিলেন, ঠিক তাই ঘোটে গেল। ষড়যন্ত্রীদের এই রকম দলভাঙা অবস্থা দেখে তিনি সুযোগ নিলেন। তাদেরকে পৃথক ভাবে

আক্রমণ কোরে ছিন্ন ভিন্ন কোরে দেবার জন্য তিনি সৈন্যদের হুকুম দিলেন। হুকুম তামিল হোল। সোলতানার সৈন্যদল বিভিন্ন দলে বিভক্ত হোয়ে এক একটা ষড়যন্ত্রীদের উপর ঝড়ের মত গিয়ে পোড়্তে লাগ্লো। তাদের প্রবল আক্রমণ সহ্য কোর্তে না পেরে বিদ্রোহীরা ছিন্ন ভিন্ন হোয়ে কতক পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল, কতক বা নিরুপায় হোয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিল। যারা প্রাণ দিল তাদের মধ্যে ছিল মালিক সইফউদ্দিন কুচী, তার ভাই এবং মালিক আলাউদ্দিন শের খানি। পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো উজীর নিজাম উল্ মুল্ক জুনায়দী এবং তার সহকারীরা। তবে উপস্থিতের জন্য প্রাণ বাঁচালেও এর অল্প দিন পরেই উজীরের মৃত্যু হয়। তিনি আত্মরক্ষার জন্য সারমোর পাহাড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিছু দিন পরে সেই খানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বিদ্রোহের শেষে সোলতানা পূর্ব্বতন উজীরের অধস্তন খাজা মেহেদী গজনবীকে উজীরী প্রদান

করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিজাম্ উল্ মুল্ক উপাধিতে ভূষিত করেন। মালিক সইফউদ্দীন আইবক্‌কে কুলূতুগ খান উপাধি দিয়ে তাঁর উপর সৈন্য বাহিনীর ভার অর্পন করেন। অন্যতম বিদ্রোহী নেতা কবীর খানি সোলতানার বশ্যতা স্বীকার কোরেছিলেন। তিনি তাকে পূর্ব্বপদে অর্থাৎ লাহোরের শাসন কর্ত্তার পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। কবীর খানির ন্যায় আরও দুই একজন বিদ্রোহী নেতাকেও তিনি অনুরূপ ভাবে তাদের পূর্ব্ব মর্য্যাদা প্রদান করেন। এই ভাবে সোলতানা রাজিয়ার সিংহা-সনারোহণের পর প্রথম বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

বিদ্রোহী নেতাদিগকে ক্ষমা এবং তাদের পূর্ব্ব পদে ও মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাতে সোলতানা রাজিয়ার হৃদয়ের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে কতদূর হিংসা বিদ্বেষের বিরোধী এবং ক্ষমাশীল ছিলেন, এই ঘটনাতেই তা সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারা যায়।

—চার—

বিদ্রোহের অবসান হোলে সোলতানা রাজিয়া রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ কোর্‌লেন। তাঁর প্রথম দৃষ্টি পোড়্‌লো রন্থোর দুর্গের দিকে। এই দুর্গ সে সময়ে হিন্দু রাজাদের দখলে ছিল, সোলতানা সেটাকে নিজের দখলে আন্‌বার জন্য স্থিরসঙ্কল্প হোলেন।

আগেই বোলেছি, সোলতানা কুল্‌তুগ খানকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ কোরেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই উঁচু পদমর্য্যাদা তিনি বেশীদিন ভোগ কোর্‌তে পারেন নি। সৈন্যাপত্য লাভের

অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর স্থানে সম্রাজ্ঞী কুতুবুদ্দিন হাসানকে নিযুক্ত করেন। এবং রন্থোর অভিযানের জন্য তাঁকেই সসৈন্যে প্রেরণ করেন।

সম্রাজ্ঞীর ধারণা ছিল, রন্থোর দুর্গ অধিকার করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। কারণ এই দুর্গের উপর সে সময়ের হিন্দু রাজাদের বিশেষ মমতা ছিল, সাধ্যমত চেষ্টা না কোরে তাঁরা এটাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না, এই ছিল তাঁর ধারণা; কিন্তু কাজের সময় বুঝা গেল সম্রাজ্ঞীর সে ধারণা একেবারেই ভুল। অল্প আয়াসেই কুতুবুদ্দিন হাসান দুর্গ দখল কোরে বোস্‌লেন।

এই জয়ের সংবাদে সোলতানা বিশেষ সন্তুষ্ট হোলেন। যদিও এ জয় যথেষ্ট গৌরবজনক নয়, তবু রাজ্য-বিস্তারের প্রাথমিক চেষ্টার সুফল হিসাবে তিনি একে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান কোর্‌লেন। এর জন্য রাজধানীতে ক্রমাগত দু-দিন ধোরে উৎসব সমারোহ চোল্‌লো। দীন-দুঃখী অনাথ আতুরদের রাজকোষ থেকে ধন বিতরণ করা হোল।

রন্থোর দুর্গ জয়ের পর সোলতানা উপস্থিতের জন্য সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন কোর্‌লেন। রাজ্য-বিস্তারের সঙ্কল্প ছেড়ে তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা দূর ও তাঁর পিতা সোলতান আলতামাশের আমলের আইন-কানুনগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত কোর্‌তে যত্নবতী হোলেন। তিনি ভাল কোরেই বুঝেছিলেন, যতদিন পর্যন্ত ভিতরে গলদ থাকবে, আইনের অনুশাসনের প্রতি লোকের সম্যক আস্থা না আস্‌বে, তত দিন পর্য্যন্ত রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে না। আর তা না হোলে রাজের অস্তিত্বও বেশীদিন থাক্‌বে না। কাজেই রাজ্য-বিস্তারের জন্য চেষ্টা না কোরে তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীন উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হোলেন, এবং বিচার-বিভাগ, শাসন-বিভাগ, রাজস্ব-বিভাগ প্রভৃতি সকল বিভাগের উপরেই সতর্ক দৃষ্টি রাখ্‌লেন। কোন রকমে এতটুকু অবিচার, পীড়ন বা পক্ষপাতিতা যাতে না হয়, তার সুষ্ঠু এবং সুন্দর ব্যবস্থা কোরলেন। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সংবাদ নেবার জন্য সতর্ক এবং

সুচতুর গুপ্তচর নিযুক্ত কোরলেন। এই ভাবে অল্প দিনের ভিতরেই সাম্রাজ্যের সকল স্তরেই একটা আমূল পরিবর্ত্তন এনে দিলেন।

এই ভাবে ক্রমাগত দুটী বৎসর কেটে গেল। এই সময়ে সোলতানা প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে দরবার কোরতেন। সিংহাসন থেকে জনসাধারণকে প্রত্যহ একবার কোরে দর্শন দিতেন। তাদের অভাব অভিযোগের কথা নিজের কাণে শুন্‌তেন এবং ন্যায় ধর্ম্মের নীতি অনুসারে সে-সকলের বিচারও কোর্‌তেন।

কিন্তু এত কোরেও সোলতানা শেষ রক্ষা কোর্‌তে পারলেন না। একটা বিশেষ কারণে জনমত তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল হোয়ে উঠ্‌লো। এমন সুশাসন, এতখানি ন্যায়নিষ্ঠা, শত্রু মিত্রে সমান ব্যবহার, সর্ব্ব সাধারণের প্রতি সস্নেহ সদয় ব্যবহার সমস্তই ব্যর্থ হোয়ে গেল। কেন—সে কথা পরে বোল্‌ছি।

———

—পাঁচ—

জামালউদ্দীন ইয়াকুৎ নামে সোলতানার এক আবিসিনীয়া দেশীয় ক্রীতদাস ছিল। লোকে তাকে হাব্‌শী দাস বোল্‌তো। সে ছিল সোলতানার ঘোড়াশালার অধ্যক্ষ এবং খুব সুদক্ষ ঘোড়-সওয়ার। যে-কোন দুষ্ট প্রকৃতির ঘোড়া হউক না, সে তাকে আয়ত্ত্বের মধ্যে এনে নিজের ইঙ্গিতে পরিচালিত কোরবেই। এ কাজে সারা হিন্দুস্থানে তার জোড়া ছিল না। সোলতানা নিজে একজন উঁচুদরের ঘোড়-সওয়ার ছিলেন। দুর্দ্দান্ত ঘোড়াকে বশে আন্‌তে এবং ঘোড়ায় চোড়ে আমোদ উপভোগ

কোর্‌তে তিনি বড় ভালবাস্‌তেন। এ কাজে জামাল-উদ্দিন ছিল তাঁর একমাত্র সহায়। দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর মূল্য দিয়ে তিনি দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির ঘোড়া আমদানী কোর্‌তেন রাজধানীতে এবং জামালউদ্দিনের সাহায্যে সেগুলোকে বশীভূত ও শিক্ষিত কোরে তুল্‌তেন। এটা তাঁর একটা দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বোল্‌লেই হয়।

কাজটা কিন্তু রাজ্যের হোম্‌রা-চোম্‌রাদের চোখে কেমন বিসদৃশ ঠেক্‌তে লাগ্‌লো। বিশাল হিন্দু-স্থানের সম্রাজ্ঞী হোয়ে সামান্য একটা হাব্‌শী দাসের সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে এই খেলা—এটা তাঁরা মোটেই যেন সহ্য কোর্‌তে পারলেন না। পরস্পরে নানা রকম কাণাঘুষা কোর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু হঠাৎ প্রকাশ্যে কোন রকম প্রতিবাদ কোর্‌তে পারলেন না। কারণ, সোলতানা তখন সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিতা। বিদ্রোহ অশান্তি সমস্তই দমন কোরে তিনি দেশে একটা নিরাবিল শান্তি ফিরিয়ে

এনেছেন। এবং তাঁর সুশাসনে সস্নেহ পালনে জন-সাধারণ নিশ্চিন্ত সুখে দিন যাপন কোর্‌ছে, এসময় হঠাৎ তাঁর কোন কাজের প্রতিবাদ কোর্‌তে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। দেশের প্রায় পনের আনা লোক তাঁর পক্ষপাতী। তাঁর বিরুদ্ধে কথা বোল্‌তে গেলে তারা সকলেই ক্ষেপে উঠবে, কাজেই মনে মনে বিরক্ত হোলেও প্রকাশ্যে কেউ কিছু বোল্‌তে ভরসা কোর্‌লেন না। তার চেয়ে তাঁরা গোপনে গোপনে জনসাধারণের মনে বিরক্তির বিষ ছড়িয়ে দেওয়াই ভাল মনে কোর্‌লেন এবং কার্য্যতঃ তা-ই কোর্‌তে লাগলেন।

প্রথম প্রথম লোকে হোমরা-চোমরাদের কথায় বড়-একটা কাণ দিলনা। কারণ, তারা জান্‌তো সোলতানা ছেলেবেলা থেকেই ঘোড়ায় চোড়্‌তে ভালবাসেন। এটা তাঁর আবাল্যের সখ। জামাল-উদ্দিন ঘোড়াশালার অধ্যক্ষ—উৎকৃষ্ট ঘোড়-সওয়ার, সে তাঁকে সাহায্য করে। এতে দোষের কি আছে? জামালউদ্দিন না হোয়ে অন্য কেউ যদি ঘোড়াশালার

কর্ত্তা হোত, তাহোলেও ত সম্রাজ্ঞী তার সাহায্য নিতেন।

মনে মনে এই রকম একটা বুঝে লোকে কথাটায় বড় একটা কাণ দিলনা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা এতদূর গিয়ে দাঁড়ালো যে, প্রতিবাদ করা ভিন্ন উপায় রইল না। সোলতানা জামালউদ্দিনকে ঘোড়াশালার অধ্যক্ষ থেকে একেবারে আমীর উল্ ওমরার পদে উন্নীত কোরে দিলেন। তাঁর এই আচরণ সকলেরই কাছে অত্যন্ত বিসদৃশ ও আপত্তিকর বোলে মনে হোল। বিশেষ কোরে আমীর ওমরা এবং অমাত্যগণ একজন হাব্‌শী দাসকে নিজেদের সমশ্রেণীভুক্ত কোর্‌তে দেখে সোলতানার প্রতি একেবারে খড়্গহস্ত হোয়ে উঠ্‌লেন।

সোলতানা, জামালউদ্দিনের দক্ষতা এবং বিশ্বস্ততা দেখেই তাকে সাম্রাজ্যের প্রধানগণের সঙ্গে সমান মর্য্যাদা দান কোরেছিলেন। বাস্তবিক তিনি গুণের আদর জান্‌তেন এবং কাজেও

তা' প্রকাশ না কোরে থাক্‌তে পার্‌তেন না। জামালউদ্দিনের ব্যাপারেও পারেন নি। কিন্তু আমীর ওমরার দল এটাকে অতি মাত্রায় বাড়াবাড়ি বোলে গ্রহণ কোরলেন। সোলতানার ভুল এই খানে যে, তিনি রেখে ঢেকে কাজ কোর্‌তে পারেন নি। একেবারে আমীর উল্‌ ওমরার মর্য্যাদা দান না কোরে তিনি যদি ধাপে ধাপে জামাল‌উদ্দীনকে ক্রমান্বয়ে উন্নতির সোপানে তুলে ধোর্‌তেন, তাহোলে বোধ হয় এত শীঘ্র দেশময় বিষের আগুণ ছড়িয়ে পোড়তে পারতো না।

যাহোক্, এই ব্যাপার নিয়ে সারা দেশে সত্য মিথ্যা নানা রকম গুজবের সৃষ্টি হোতে লাগলো। লোকের মনের বিরক্তি ও অশ্রদ্ধা দিনে দিনে বেড়েই চোল্‌লো। দেখতে দেখতে প্রকাশ্য বিদ্রোহে সম্রাজ্ঞীর কাজের প্রতিবাদ আরম্ভ হোল।

———

Prince of Wales Museum, Bombay.

রাজিয়া

—ছয়—

সর্ব্ব প্রথম বিদ্রোহ আরম্ভ কোরলেন, লাহোরের শাসনকর্ত্তা মালিক কবীর খান। এই মালিক কবীর খান ইতিপূর্ব্বে একবার অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে অভিযান কোরেছিলেন। সেটা সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরে। একথা আমরা আগেই বোলেছি। সে সময়ে সদলবলে পরাজিত হোয়ে তিনি সোলতানার কাছে ক্ষমা প্রার্থী হোয়েছিলেন। সোলতানা তাঁর সে প্রার্থনা মঞ্জুর কোরেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে তাঁর

পূর্ব্ব পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কোরেছিলেন। সেই কবীর খানই আবার কৃতজ্ঞতার মাথায় পদাঘাত কোরে ধন মান জীবনদাত্রী সোলতানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কোর্‌লো।

এইখানে একটা কথা বোলে রাখা ভাল। সোলতানা রাজিয়া অবিবাহিতা ছিলেন। আমীর ওমরা, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত বংশের অনেকেই তাঁকে মনে মনে স্ত্রীরূপে লাভ করবার আকাঙ্খা পোষণ কোরতেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সাহস কোরে কিছু বোলতে পারতেন না। কারণ, তাঁরা জান্‌তেন, তাঁরা কোনদিক্ দিয়েই সোলতানার স্বামী হবার যোগ্য নন এবং তাঁর কাছে সে সম্পর্কে পয়গাম পাঠালে তিনি নিশ্চয়ই তা' প্রত্যাখ্যান কোর্‌বেন; কাজেই সাহস কোরে কেউ এগুতে পারেননি। এখন জামালউদ্দীনের উপর হঠাৎ এই অনুগ্রহ দেখে তাঁদের মনে দারুণ সন্দেহ জেগে উঠ্‌লো। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সোলতানা এই হাব্‌শী ক্রীতদাসকেই পতিত্বে বরণ

কোরবেন। কাজেই তাঁদের মনে হিংসার আগুন দাউ দাউ কোরে জ্বোলে উঠলো।

কিন্তু এটা তাঁদের মারাত্মক ভুল। হিংসায় অন্ধ হোলে মানুষের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হোয়েছিল। নইলে সোলতানা রাজিয়ার মত একজন পরমা সুন্দরী সুশিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না কুমারী তা-ও আবার সাধারণ কুমারী নন—বাদশাজাদী, সর্বোপরি যিনি আসমুদ্র হিন্দুস্থানের ভাগ্যবিধাত্রী—তাঁর পক্ষে একজন হাব্‌শী ক্রীতদাসকে পতিত্বে বরণ করা কি কখনও সম্ভব হোতে পারে? তবে তিনি যে জামালউদ্দীনের প্রতি এতখানি অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন, তার একমাত্র কারণ, গুণীর গুণের আদর না করা, তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান না দেওয়া তিনি অন্যায় এবং পাপ বোলে মনে কোরতেন। তবে আগেই বোলেছি, কাজটা একটু ধীরে হোলেই সব দিক রক্ষা হোত। একেবারে এতদূর কোরতে যাওয়াটা তাঁর ভুল হোয়েছিল

এবং এই ভুলই শেষ পর্য্যন্ত তাঁর পতনের কারণ হোয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যাহোক, মালিক কবীর খান বিদ্রোহ আরম্ভ কোরলেন। সোলতানাও দুর্ব্বল হাতে শাসন দণ্ড ধরেন নি। সংবাদ পেয়ে তিনি নিজেই সসৈন্যে অভিযান কোরলেন, কৃতঘ্ন কবীর খানকে শাস্তি দেবার জন্য। মধ্য পথে উভয় দলের সাক্ষাৎ হোল। কবীর খান কল্পনাও কোরতে পারেননি যে, সম্রাজ্ঞী নিজে তার বিরুদ্ধে অভিযান কোরবেন। তাই একান্ত আকস্মিক ভাবে তাঁকে সেনাবাহিনীর পুরোভাগে দেখে তিনি যেন দোমে গেলেন। তাঁর সৈন্যেরাও সম্রাজ্ঞীকে সম্মুখে দেখে কেমন যেন হতভম্ব হোয়ে পোড়্লো। সাম্‌না-সাম্‌নি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধোর্তে তাদের সাহসে কুলোলো না। তারা কবীর খানকে তাদের অক্ষমতার কথা জানালো। কবীর খানের মাথায় আকাশ ভেঙে পোড়্লো। নিরুপায় হোয়ে কৃত অপরাধের জন্য তিনি আগের মত এবারও

সোলতানার কাছে ক্ষমা চেয়ে পাঠালেন। করুণার প্রতিমূর্ত্তি সোলতানা সে কাতর প্রার্থনা মঞ্জুর না কোরে পারলেন না। এবারও তিনি কবীর খানকে ক্ষমা কোরলেন। আগের মতই তার জীবন দান দিলেন, পূর্ব্ব পদে প্রতিষ্ঠিত কোরলেন। উপরন্তু আমরণ বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতি পেয়ে মুলতানের শাসনভারও তার উপর ছেড়ে দিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বোল্‌লে সোলতানা রাজিয়ার জীবনের একটা বড় পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কথাটা এই—সোলতানা রাজিয়ার দুটী দিক ছিল। একটী নারীত্বের দিক অপরটি সম্রাজ্ঞীত্বের দিক। এই দু'টী দিক একটী অপরটীর বিপরীত হোলেও রাজিয়া উভয় দিকেই সম্পূর্ণ-তার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর মধ্যে কোনটাই অপরটীর চেয়ে কম প্রবল ছিল না, তাই একটী অপরটীকে নিষ্প্রভ কোরতে পারেনি। সেইজন্য আমরা দেখ্‌তে পাই, যেখানে তাঁর সম্রাজ্ঞীত্ব প্রবল হোয়ে কাজ কোরছে, সেখানে তাঁর নারীত্ব এসে

তাঁকে বাধা দিচ্ছে। আবার যেখানে তাঁর নারীত্ব প্রবল হোয়ে কাজ কোর্‌ছে, সেখানে তাঁর সাম্রাজ্ঞীত্ব এসে তাঁকে বাধা দিচ্ছে। তাই একটানা ভাবে নির্ব্বিবাদে তিনি কোন কাজ কোরে যেতে পারেন নি। তাঁর ভিতরের বাধা প্রতি পদে তাঁর সম্মুখে অন্তরায় সৃষ্টি কোরেছে। কাজেই সকল গুণগ্রামের অধিকারিণী হোলেও তাঁর পরিণাম ব্যর্থতার একটা মর্ম্মন্তুদ পরিহাসে পরিণত হোয়েছিল।

তিনি যখন সম্রাজ্ঞী হোয়েছিলেন, তখন সহজাত কোমল প্রবৃত্তিগুলোকে দূরে সরিয়ে যদি আবশ্যক কঠোরতাকে অবলম্বন কোরে শাসনকার্য্য চালিয়ে যেতেন, তাহোলে দিল্লীর দাস বংশের ইতিহাস আজ অন্যরূপ হোত। কিন্তু তা তিনি কোর্‌তে পারেন নি। নারীর স্নেহ-কোমল প্রবৃত্তি প্রবল হোয়ে তাঁর সে পথে অন্তরায় সৃষ্টি কোরে-ছিল। তাই কবীর খানের মত কৃতঘ্ন অন্নভোজীকে বারংবার ক্ষমা কোরে তিনি অকাল মৃত্যুকে

আমন্ত্রণ কোরে এনেছিলেন। নারীর হৃদয় যখন করুণায় গোলে যায়, তখন তার নিজের অস্তিত্বকে সে ভুলে যায়। রাজিয়াও ভুলেছিলেন। রাজিয়া নারী ছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সম্রাজ্ঞীও ছিলেন এবং একথাও সত্য যে, সম্রাজ্ঞীর পক্ষে নারীর কর্ত্তব্যের চেয়ে সম্রাজ্ঞীর কর্ত্তব্যই বড়। সম্রাজ্ঞী রাজিয়া এই চরম এবং পরম সত্য কথাটা কোন-দিনই ভাবেননি। এইটাই হোয়েছিল তাঁর ভুল —মারাত্মক ভুল। আর এ ভুলের প্রায়শ্চিত্তও কোরতে হোয়েছিল চরম—বুকের রক্ত দিয়ে।

———

—সাত—

কবীর খানকে দমন কোরে সোলতানা রাজধানীতে ফিরে এলেন বটে, কিন্তু আগুণ নিভ্‌লোনা। কিছুদিন পরেই ভাটীণ্ডার শাসনকর্ত্তা মালিক আল্‌তুনিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত কোর্‌লো। আল্‌তুনিয়া চেল্‌গানির তুর্কী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। সোলতানা যখন সিংহাসনে বসেননি, যখন তিনি শাহী হেরেমের শাহজাদী মাত্র, তখন থেকেই আল্‌তুনিয়া তাঁর রূপ-লাবণ্য ও গুণগ্রামের কথা শুনে তাঁকে পত্নীরূপে লাভ করবার দুরাশা মনে মনে পোষণ করে আস্‌ছিলেন। তিনি জান্‌তেন

সোলতানা সহজে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দেবেন না। তাঁকে সম্মতি দানে বাধ্য কোর্‌তে হবে। তাই তাঁরই অন্নে পুষ্ট হোয়ে তাঁরই বিরুদ্ধে তিনি গোপনে গোপনে শক্তি সঞ্চয় কোর্‌ছিলেন। রাজ্যের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন লোককেও তিনি ইতিমধ্যে হাত কোরে ফেলেছিলেন। এতদিন সুযোগের অপেক্ষায় থেকে এইবার সময় বুঝে তিনি বহুদিনের পোষিত আশা সফল করবার জন্য সোজা হোয়ে দাঁড়ালেন।

সোলতানার কাণে যখন এসংবাদ পৌঁছুল, তখন তিনি আর স্থির থাক্‌তে পারলেন না। তিনি আলতুনিয়ার দুরাশার কথা শুনেছিলেন, এখন এই ভাবে তার সেই আশা পূরণের প্রয়াস দেখে তাঁর ধমনীর রক্ত গরম হোয়ে উঠ্‌লো। দুর্ব্বৃত্তের স্পর্দ্ধার সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য একদল নির্ব্বাচিত তুর্কী সৈন্য নিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযান কোরলেন।

সোলতানা রাজিয়ার ভাগ্যাকাশে তখন কাল-মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল। বিধাতা তাঁর উপর

বিরূপ হোয়েছিলেন। তাই প্রতি কার্য্যে তাঁর ভুল হোচ্ছিল। এ ক্ষেত্রেও তিনি একটা মারাত্মক ভুল কোরে বোস্‌লেন।

আগেই বোলেছি আল্‌তুনিয়া চেলগানির তুর্কী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। আর সম্রাজ্ঞী তার সঙ্গে যুদ্ধ কোর্‌তে চোল্‌লেন কিনা তারই সম্প্রদায়ভুক্ত অর্থাৎ তুর্কী সৈন্যদল নিয়ে। এর ফল যা' হবার তা-ই হোল। অর্দ্ধেক পথে গিয়েই সোলতানার সেনাবাহিনী বিগ্‌ড়ে গেল। তারা সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা কোরলো, আল্‌তুনিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধোরবো না। সোলতানা নিরুপায়। কাকে নিয়ে তিনি লোড়বেন। সেই মাঝ পথেই আল্‌তুনিয়ার হাতে তাঁকে ধরা দিতে হোল। আল্‌তুনিয়ার নির্দ্দেশ ক্রমে তিনি ভাটিণ্ডা দুর্গে অবরুদ্ধ হোয়ে রইলেন।

এদিকে সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে যে-সব তুর্কী সেনা-নায়ক এসেছিল, তারা সদলবলে দিল্লীতে ফিরে গিয়ে রাজধানীর হোম্‌রা-চোম্‌রাদের সঙ্গে যোগ

দিল। এই সব হোম্‌রা-চোম্‌রারা ভিতরে ভিতরে সোলতানার উপর রেগে আগুণ হোয়েছিলেন, কিন্তু ভয়ে সাম্‌না-সাম্‌নি কিছু বোল্‌তে পার্‌তেন না। এখন তুর্কী নায়কদের সাহায্য পেয়ে তাঁরা সোজা হোয়ে কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন। এবং মরহুম সোলতান আলতামাশের অপর ছেলে বায়-রামকে দিল্লীর মসনদে নিয়ে বসালেন। এই বায়রাম একান্ত বিলাসী এবং নিতান্ত অপদার্থ ছিলেন। কিন্তু নায়কদের সে-সব বিচার কোরে দেখবার অবসর হোল না। সিংহাসনে একজনকে বসানো দরকার, তাই বসালেন। পরিণাম যে কি হবে একবার ভেবে দেখলেন না।

আল্‌তুনিয়ার কাছে যখন এ সংবাদ গেল, তখন তিনি মহা চিন্তায় পোড়ে গেলেন। তিনি আশা কোরেছিলেন, আরও কিছু শক্তি সঞ্চয় কোরে সোলতানাকে নিয়ে দিল্লী অভিযান কোরবেন, তার পর সিংহাসন অধিকার কোরে সোলতানাকে বিয়ে কোরবেন। কারণ তখনও পর্য্যন্ত বিয়েতে যথেষ্ট

বাধা ছিল, সিংহাসন অধিকার কোরে বোস্‌তে পার্‌লে সে বাধা দূর হোয়ে যাবে। তখন সোলতানারও অসম্মতির কারণ থাক্‌বেনা। আর থাক্‌লেও সে অসম্মতি কে শুন্‌বে? সোলতানা তখন একজন সাধারণ নারী মাত্র, সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস তাঁর হবেনা। মনে মনে এই আশা পোষণ কোরে তিনি শক্তি সঞ্চয় কোরেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এই সংবাদ শুনে যেন দোমে গেলেন।

কিন্তু আল্‌তুনিয়া একেবারে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। তিনি সোলতানার কাছে সাহায্য চাইলেন। তার সর্ত্ত হোল এই যে সোলতানা দিল্লী অভিযানে যদি তাকে সাহায্য করেন, তাহোলে বিনিময়ে তিনি তাঁকে মুক্তি দেবেন।

সোলতানাও ঠিক এই রকম একটা চাইছিলেন। একবার মুক্তি পেলে তিনি বুঝে নেবেন কে আল্‌-তুনিয়া আর কে বাহরাম। তিনি আলতুনিয়ার সর্ত্তে রাজী হোলেন।

অল্পদিনের ভিতরেই সোলতানার নামে প্রচুর সৈন্য সংগৃহীত হোল। আলতুনিয়াসহ সেই বিরাট বাহিনীকে নিয়ে তিনি দিল্লী অভিমুখে রওনা হোলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল আগে সিংহাসন অধিকার কোরবেন, তার পর আলতুনিয়ার ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেবেন।

কিন্তু বিধাতা বিরূপ। মনের সঙ্কল্পকে তিনি কাজে পরিণত কোর্‌তে পারলেন না। দিল্লীর নিকটেই বাহরামের প্রেরিত সৈন্য দলের সঙ্গে তাঁর সঙ্ঘর্ষ হোল। এই সেনাদলের নায়ক ছিল সোলতান আলতামাশের জামাই মালিক আয়েজ উদ্দীন বলবন। লোকটা কূটরণনীতিতে বিশেষ দক্ষ এবং সাহসী ছিল। তার সুপরিচালনা গুণে তার সৈন্য-দলের সম্মুখে সোলতানার সেনাদল টিঁকে থাকৃতে পারলোনা। রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল। সোলতানা শোচনীয় রূপে পরাজিত হোয়ে পুনরায় ভাটিণ্ডা দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। দিল্লীতে বাহরামের জয়জয়কার পোড়ে গেল।

পরাজিত হোলেও সোলতানা নিশ্চেষ্ট রইলেন না। ভাটিণ্ডায় গিয়ে তিনি নূতন কোরে শক্তি সঞ্চয়ে মনোনিবেশ কোরলেন এবং অল্পদিনের ভিতরেই নূতন কোরে একটা শক্তিশালী বাহিনী গঠন কোরে পুনরায় দিল্লী অভিযান কোরলেন।

বায়রামের নির্দ্দেশ ক্রমে'এবারও মালিক আয়েজুদ্দীন বলবন তাঁর গতিরোধে অগ্রসর হোল। কায়টুল নামক স্থানে উভয় দলের সাক্ষাৎ হোল। আয়েজুদ্দীন বলবন মনে কোরেছিলেন পূর্ব্বের মত এবারও তুড়ী মেরে বাজী জিতবেন, কিন্তু কার্য্যকালে দেখ্‌লেন সম্পূর্ণ বিপরীত। সোলতানা স্বয়ং অশ্বারোহণে পুরোভাগে দাঁড়িয়ে বাহিনী পরিচালনা কোরতে লাগলেন। এতে তাঁর সৈন্যদল দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রুসৈন্যের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পোড়লো।

ঘোরতর যুদ্ধ বাধলো। কিন্তু শেষ রক্ষা হোল না। বায়রামের তুলনায় সোলতানার সৈন্য দল ছিল মুষ্টিমেয়। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে

রণে ভঙ্গ দিতে হোল। তিনি শত্রুহস্তে বন্দী হোলেন। তারপর তাঁর যে শোচনীয় পরিণতি হোল, তা' ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বায়রামের আদেশে বন্দী অবস্থায় তাঁকে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হোল।

এই ভাবে ভারতের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাজ্ঞীর জীবন-নাট্যের অবসান ঘটে। রাজোচিত সমস্ত সদ্‌গুণে ভূষিত হোয়েও চক্রীদলের চক্রান্তে বুকের রক্তে তাঁকে সিংহাসনের ঋণ শোধ দিতে হয়। অদৃষ্টের এর চেয়ে মর্ম্মন্তুদ পরিহাস আর কি হোতে পারে?

চাঁদ সোলতানা

চাঁদ সোলতানা

—এক—

তোমরা বোধ হয় ভূগোলে পোড়েছ যে, আমাদের এই দেশ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। বিন্ধ্যপর্ব্বত থেকে সমস্ত উত্তর ভাগের নাম আর্য্যাবর্ত্ত আর দক্ষিণ ভাগের নাম দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্য। প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর আগে মহারাণী এলিজাবেথ যখন ইংলণ্ডে রাজত্ব কোর্‌ছিলেন, ঠিক সেই সময় এই দাক্ষিণাত্যে রূপে গুণে শৌর্য্যে বীর্য্যে তাঁরই সমতুল্য এক বীর-নারী রাজত্ব কোর্‌তেন। আজ তাঁরই কথা আমি তোমাদের বোল্‌তে বোসেছি। এই অসামান্যা বীর রমণী

চাঁদ সোলতানা নামে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হোয়ে আছেন।

আমরা যে সময়ের কথা বোল্‌ছি, তখন সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও আহমদনগর এই দুইটী মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ও সমৃদ্ধিতে আর সব রাজ্যকেই ছাড়িয়ে উঠেছিল। চাঁদ সোলতানা ছিলেন আহমদ নগরের রাজা হোসেন নিজাম শাহের মেয়ে। তাঁর জন্মকালে আহমদ নগর ও বিজাপুরের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু সদ্ভাবের যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল, একথা উভয় দেশের রাজাই মনে প্রাণে স্বীকার কোরতেন। কারণ তাঁদের অসদ্ভাবের খবর পেয়ে বহিঃশত্রুরা তাঁদের রাজ্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়েছিল— সুযোগ পেলেই আক্রমণ কোরবে। সেই জন্য মনোমালিন্য দূর কোরে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক পাতাবার জন্য উভয়েই মনে মনে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু সুযোগের অভাবে কেউ কারুকে মনের কথা মুখ ফুটে বোল্‌তে

পারতেন না। চাঁদরাণীর জন্ম হোতেই সে সুযোগ এসে গেল। কেমন কোরে—তাই এইবার বোলব।

চাঁদ রাণী অসাধারণ রূপ-সৌন্দর্য্য নিয়ে তুনিয়ায় এসেছিলেন। কৈশোরে পা দিতে না দিতেই তাঁর রূপের কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পোড়্লো। সঙ্গে সঙ্গে গুণের ব্যাখ্যাও লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগ্লো। অতি অল্প বয়সেই চাঁদরাণী আরবী ফার্সী ও তুর্কী ভাষায় বিশেষ দখল লাভ কোরলেন। লোকে দেখে অবাক হোয়ে গেল যে, অতটুকু মেয়ে কেমন কোরে এই সব তুরুহ বিদেশী ভাষা আয়ত্ত্ব কোরলো।

মেয়ের এই সব গুণগ্রাম দেখে এবং সুখ্যাতি শুনে সোলতান হোসেন নিজাম শাহ মনে মনে বড়ই খুসী হোলেন এবং স্থির কোরলেন, এই মেয়েকে অবলম্বন কোরেই তিনি বিজাপুরের সঙ্গে মধুর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন কোরবেন। একটা সুযোগও সে সময় জুটে গেল। বিজানগরের হিন্দু

রাজারা তখন খুব প্রবল হোয়ে উঠেছিল। তাঁদের দমন কোরতে হোলে আহমদ নগর ও বিজাপুরের মিলিত শক্তির প্রয়োজন। বিজাপুর-সোলতান আলি আদিল শাহও যে কথাটা বুঝেন নাই তা' নয়। তাই নিজাম শাহী সোলতান যখন তাঁর কাছে মেয়ের বিয়ের পয়গাম পাঠালেন, তখন আনন্দের সঙ্গে তিনি তা' গ্রহণ কোরলেন। উপরন্তু নিজের ভগিনী হদিয়ার সঙ্গে আহমদ নগরের যুবরাজ মোরতজার বিয়ের জন্যও একটা পাল্টা পয়গাম নিজামশাহী সোলতানের দরবারে পাঠালেন। এই ভাবে দক্ষিণাত্যের তুইটী শ্রেষ্ঠ মুসলীম রাজ্যের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর হোল।

———

—দুই—

বিজাপুর ও আহমদ নগর দুই রাজধানীতেই উৎসবের ধূম পোড়ে গেল। বিজাপুরে সোল-তানের বিবাহ, আহমননগরে যুবরাজের বিবাহ সে যে কি আড়ম্বর, কি সমারোহ তা' ভাষায় প্রকাশ করবার নয়। লোকে আহার নিদ্রা ছেড়ে ঘর বাড়ী সাজাতে লাগ্‌লো। কত দেশ থেকে কত শিল্পী, কত ভাস্কর কত চিত্রকর এল, নগর সাজাবার জন্য। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিজাপুর আহমদনগর উৎসব পুরীতে পরিণত হোল তারপর নির্দ্দিষ্ট দিনে ফুলের ভূষায় ফুলের হারে, ফুলের

চতুর্দ্দোলে ফুলরাণী সেজে চাঁদরাণী বিজাপুরের সাজানো বাসরে এসে উঠলেন, আর হুদিয়া পরীরাণীর মত আহমদ নগরের রাজপুরী আলো কোরে উদয় হোলেন, বিজাপুর ও আহমদ নগর মধুর প্রীতির বন্ধনে বাঁধা পোড়লো।

বিয়ে যখন হোল, তখন চাঁদরাণীর বয়স মাত্র নয় বৎসর। কিন্তু বয়সের চেয়ে জ্ঞানে তিনি ঢের বেশী বড় হোয়ে ছিলেন। নিজাম শাহী সোলতান মেয়ের সকল দিকের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য এতটুকু ত্রুটী করেন নি। মেয়েও প্রাণপণ যত্নে বাপের শিক্ষাকে মনের মধ্যে বরণ কোরে নিয়েছিলেন। কাজেই অল্প বয়সে স্বামীর ঘরে গিয়েও তাঁকে বিশেষ অসুবিধায় পোড়্তে হয় নি।

অতি অল্প দিনের ভিতরেই বিজাপুর সোলতান আলি আদিল শাহ চাঁদরাণীকে চিনে নিলেন। তিনি বুঝিলেন নাবালিকা হোলেও চাঁদ অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী। গোড়ে নিতে পার্লে কালে এই কিশোরী ভারত-নারীর আদর্শ স্থানীয় হোয়ে

উঠ্‌বে। তাই, তখন থেকেই তিনি চাঁদরাণীকে নিজের মনোমত কোরে গোড়ে তুলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কোর্‌তে লাগলেন। অশ্বারোহণে, শিকারে, যুদ্ধক্ষেত্রে—সকল সময়ে সকল অবস্থায় নিজের সঙ্গে সঙ্গে রেখে তাঁকে হাতে-কলমে সকল বিষয় শিক্ষা দিতে লাগলেন।

বিজানগরের হিন্দু রাজাদের সঙ্গে যে মনোবাদ অনেকদিন ধোরে ধোঁয়াচ্ছিল, কিছুদিন পরে তা' জ্বোলে উঠ্‌লো। আহমদ নগর ও বিজাপুরের মিলিত শক্তি বিজানগরের উপর চেপে পোড়লো। তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। উভয় পক্ষে বহু প্রাণহানি হোল। রক্তের সাগরের বুকে আহমদ নগর ও বিজাপুরের বিজয় নিশান উড়লো। বিজানগরের হিন্দু রাজ্যের কতক অংশ মুসলমান রাজ্যে পরিণত হোল আর কতক অংশ স্থানীয় জমিদারদের দখলে এল।

এই যুদ্ধে চাঁদরাণী জয়শ্রীর মত অশ্বারোহণে স্বামীর পাশে পাশে থেকে তাঁকে সাহায্য কোরে

ছিলেন। তাঁর অদ্ভুত রণকৌশল, অপূর্ব্ব বীর্য্যবত্তা দেখে শত্রুরাও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা কোরতে বাধ্য হোয়েছিল।

যুদ্ধ জয়ের পর বড় সমস্যা দাঁড়ালো শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে। যারা হেরে গেল তাদের ভিতরে কতকগুলো দলের সৃষ্টি হোল। তারা নিকটের পাহাড়ে বা জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিল এবং সময় ও সুযোগ পেলেই লুটতারাজ কোরতে লাগলো। সোলতান আলি আদিল শাহ বড়ই বিব্রত হোয়ে পোড়লেন। অন্য উপায় না দেখে তিনি তাদের দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন কোরলেন। কিন্তু এতে ফল হোল বিপরীত। দস্যুদল সামনাসামনি যুদ্ধ করেনা, পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। যখন শুনলে, তাদের দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোয়েছে, এবং দলের দু' চারজনকে ধোরে গুরুতর শাস্তিও দেওয়া হোয়েছে, তখন তারা একেবারেই ক্ষেপে উঠ্লো। এমন ভাবে লুটপাট শুরু কোর্ল যে,

লোকের মনের ভিতর একটা বড় রকমের আতঙ্কের সঞ্চার হোল। প্রতিদিন দরবারে অভিযোগ আস্‌তে লাগ্‌লো—কারো যথা সর্ব্বস্ব লুট হোয়েছে, কারো ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে কারো স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ধোরে নিয়ে গিয়েছে। সোলতান ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত চিন্তিত হোয়ে পোড়লেন।

চাঁদরাণী স্বামীর মনের অবস্থা বুঝলেন এবং এ-ও বুঝলেন যে কঠোর নীতিতে এই দস্যুদলকে দমন করা কিছুতেই সম্ভব হবেনা। অনেক ভেবে চিন্তে স্বামীর অনুমতি নিয়ে শেষে তিনি নিজেই আসরে নেমে পোড়লেন। ইচ্ছা—সদ্ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। কঠোরতার পরিণামে শান্তি আসেনা, ইহাই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এবং সেই বিশ্বাসের বশেই সদিচ্ছা এবং সদ্ভাবের আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের হারানো শান্তি ফিরিয়ে আন্‌তে মনস্থ কোরলেন।

তিনি নিজের নামে দলপতিদের অভয় দিয়ে আহ্বান কোর্‌লেন। তাদের আশ্বাস দিলেন,

যদি তাঁর আহ্বানে তারা সাড়া দেয়, তাহোলে তাদের সমস্ত অভিযোগ তিনি মন দিয়ে শুন্‌বেন এবং ন্যায় এবং ধর্ম্মানুগত ভাবে সেগুলোর বিচার কোরবেন।

দলপতিরা চাঁদরাণীকে ভাল কোরেই জান্‌তো। তাঁর উপর তাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসও ছিল যথেষ্ট। কাজেই তাঁর আহ্বানকে তারা উপেক্ষা কোরলো না। নির্দ্দিষ্ট দিনে তারা সোলতানার দরবারে এসে হাজির হোল। সোলতানা এমন স্নেহপূর্ণ ব্যবহার তাদের সঙ্গে কোরলেন, এবং তাদের অভিযোগের এমন ন্যায্য বিচার কোরে দিলেন, যাতে তারা দ্বিরুক্তি মাত্র কোর্‌তে পারলো না। নতশিরে রাণীর আনুগত্য স্বীকার কোরে, তাঁর অনু-শাসন মেনে নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেল। লোকে দেখে শুনে অবাক হোয়ে গেল। সোলতান আলি আদিল শাহ ত তাজ্জব হোয়ে গেলেন। রাজ্যের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কোরেও তিনি যাদের দমন কোর্‌তে পারেননি, দু'টো মুখের কথায়

রাণী তাদের বশ কোরে ফেল্‌লেন। কি অসাধারণ ক্ষমতা এই নারীর। এই সময় থেকে স্ত্রীর উপর সোলতানের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বেড়ে গেল, এবং এর পর থেকে সমস্ত গুরুতর রাজকার্য্যেই তিনি স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ কোরতে লাগলেন।

—তিন—

বিবাহের ষোল বৎসর পরে অর্থাৎ চাঁদরাণীর বয়স যখন পঁচিশ বছর মাত্র, তখন তাঁর স্বামী সোলতান আলি আদিল শাহ এন্তেকাল করেন, স্বামী বিয়োগ নারী-জীবনের সব-চেয়ে বড় ক্ষতি এবং একান্ত মর্ম্মন্তুদ ঘটনা। অন্য সাধারণ স্ত্রীলোক হোলে চাঁদরাণী হয়ত একেবারে মুস্‌ড়ে পোড়তেন, সাংসারিক ব্যাপারে একান্ত বিরাগী হোয়ে নির্লিপ্ত উদাসীন জীবন যাপন কোরতেন। কিন্তু তিনি ত সে প্রকৃতির ছিলেন না। তাই স্বামী বিয়োগে শোকে মুহ্যমান হোয়ে সংসারের হাল

ছেড়ে না দিয়ে ধৈর্য্য নিয়ে বুক বাঁধলেন। স্বামীর পরিত্যক্ত রাজ্যের শাসন ও পালনকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ কোরলেন। বুকের রক্ত দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কি ভাবে তিনি ব্রত পালন কোরে গিয়েছিলেন, এইবারে সেই কথাই তোমাদের বোলবো।

সোলতান আলি আদিল শাহ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। মরবার আগে ভ্রাতুষ্পুত্র ইব্রাহিম আদিল শাহকে তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারী বোলে ঘোষণা কোরে যান। স্বামীর এই ঘোষণাকে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করবার জন্য চাঁদরাণী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। ইব্রাহিমকে তিনি অতি ছেলেবেলা থেকে কোলে কোরে মানুষ কোরেছিলেন, কাজই নিজের পেটের ছেলের মতই তাকে দেখতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে সিংহাসনে বসিয়ে তার অভিভাবিকা স্বরূপে নিজে রাজ্য শাসন কোরতে আরম্ভ কোরলেন।

আমরা আগেই বোলেছি, রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত ছোট বড় সকল ব্যাপারই সোলতানার নখদর্পণে

ছিল। তাই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব হাতে নিয়ে তাঁকে এতটুকু বেগ পেতে হোলনা। তিনি অবাধে বেশ সুষ্ঠুভাবেই রাজকার্য্য চালিয়ে যেতে লাগলেন।

কিন্তু তাঁহার এই ন্যায় ও শান্তিপূর্ণ শাসন রাজ্যের অনেক বড় বড় লোকের চক্ষুঃশূল হোল। তাঁরা প্রত্যেকেই ক্ষমতাপ্রিয়, নিজেদের প্রাধান্যের জন্য এমন কোন কাজই ছিলনা, যা তাঁরা কোরতে পারতেন না। সোলতানার কাছে তাঁদের অন্যায় প্রাধান্য চোলতোনা, পক্ষপাত ব্যবহার তাঁর কাছে ছিলনা। কাজেই তাঁদের নানা রকম অসুবিধা ঘোট্‌তে লাগ্‌লো। তাই যেকোন রকমে হোক সোলতানাকে সরাবার জন্য তাঁরা প্রাণপণে ষড়যন্ত্র আরম্ভ কোরলেন।

রাজা তখন নাবালক। সকল কথা বা সকল ব্যাপার ভাল কোরে বুঝে কাজ করবার মত বিচার-বুদ্ধি তাঁর হয়নি। উজীর ওমরা সোলতানার সম্বন্ধে নানা কথা তাঁর কাছে লাগালাগি কোর্‌তে

লাগ্‌লো। কি কোরবেন কিছু স্থির কোর্‌তে না পেরে তিনি যেন হতবুদ্ধি হোয়ে পোড়লেন।

সোলতানার স্বামীর আমলে যিনি উজীর ছিলেন, তিনিই হোলেন এই ষড়যন্ত্রের মূল। যদিও সোলতানা তাঁর প্রতি কোন খারাপ ব্যবহার করেননি, উপরন্তু তাঁকে তাঁর পূর্ব্ব পদেই বহাল রেখেছিলেন, তবুও কেবল মাত্র ক্ষমতা ও আধিপত্যের মোহেই তিনি সোলতানার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ কোরে দিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, নাবালক রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনিই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব কোরবেন, সোলতানা যে মাঝখান থেকে এসে তাঁর সাথে বাদ সাধবেন, এটা তিনি কল্পনাও কোরতে পারেননি। তাই এই আক্রোশ।

উজীর চেষ্টা কোর্‌তে লাগ্‌লেন। ইচ্ছা—মিথ্যা লাগালাগি কোরে নাবালক রাজার কাণ ভারি কোরে দিয়ে তাঁর সঙ্গে সোলতানার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া। কিন্তু এ চেষ্টা বেশীদূর অগ্রসর হোতে পারলোনা। সোলতানা সকল দিকেই সতর্ক দৃষ্টি

রাখ্‌তেন, সকলের গতি-বিধি লক্ষ্য কোরতেন। শীঘ্রই তিনি উজীরের দুষ্ট মতলব বুঝতে পেরে তাঁকে পদচ্যুত কোরলেন। রাজ্যের লোক বুঝ্‌লো, চাঁদ সোলতানা দুর্ব্বল হস্তে শাসন-দণ্ড ধারণ করেননি।

এর পর যাঁকে উজীরের পদে নিয়োগ করা হোল, তাঁর নাম কেশওয়ার খাঁ। তিনি সোলতানার স্বামীর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল তিনি তাঁর পূর্ব্বতন উজীরের পথেই চোলেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে রাণীর উপরেও চাল চাল্‌ছেন। এমন কি সোলতানার নাম পর্য্যন্ত জাল কোরে নিজের মতলব হাসেল কোরতেও দ্বিধা কোর্‌ছেন না। কিন্তু পূর্ব্বের উজীরের মত সোলতানা হঠাৎ তাঁকে সরাতে পারলেন না। কারণ, মরহুম সোলতানের বন্ধু হিসাবে আগে থেকেই তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তার উপর উজীরী পেয়ে সে প্রতিপত্তি আরও বেড়ে গিয়েছিল। কাজেই হঠাৎ একটা কিছু কোর্‌তে

গেলে বিদ্রোহ জেগে উঠ্‌তে পারে, এই ভয়ে সোলতানা সহসা কিছু কোরলেন না, তবে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

সোলতানার এ মনোভাব বুঝ্‌তে কেশওয়ার খাঁর দেরী হোল না। তিনি নিজের পথ পরিস্কার করবার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব সোলতানাকে সরাবার চেষ্টা কোরতে লাগলেন। লোকের মনে তাঁর সম্বন্ধে একটা অতি খারাপ ধারণা জাগিয়ে দেবার জন্য তিনি গোপনে গোপনে প্রচার কোরতে লাগলেন যে, সোলতানা তাঁর ভাই আহমদনগরের নিজামশাহী সোলতান মোরতজা শাহের সঙ্গে বিজাপুর আক্রমণের ষড়যন্ত্র কোরছেন। কথাটা প্রথমে গোপনে প্রচার হোচ্ছিল, কিন্তু তাতে কোন ফল হোল না দেখে অবশেষে দরবার মণ্ডপে রাজা এবং আমীর ওমরা সকলের সাম্‌নে তিনি প্রকাশ কোরে ফেল্‌লেন এবং অবিলম্বে সোলতানাকে রাজধানী থেকে সরাবার আবেদন পেশ কোরলেন।

সম্ভব নয়, রাজধানীতে বাস করাও বিপদসঙ্কুল। কাজেই একদিন রাত্রির অন্ধকারে গা ঢেকে তিনি রাজধানী ছেড়ে আহমদনগর, পরে গোলকুণ্ডার পথে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রাণে বাঁচতে পার্‌লেন না। পথের মাঝেই গুপ্ত শত্রুর হাতে তাঁর জীবনের শেষ হোল।

———

—চার—

কেশওয়ারের পলায়ন ও হত্যার খবর বিজাপুর পৌঁছুতে একটুও দেরী হোল না। রাজা ইব্‌রাহিম আদিল শাহ সসৈন্যে সাতারা দুর্গে গিয়ে সোলতানাকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আন্‌লেন। সোলতানা আগের মতই আবার শাসনদণ্ড নিজের হাতে নিলেন।

কিন্তু রাজ্যের ভিতরের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় হোয়ে উঠেছিল। কুশাসনে ও অত্যাচারে চারিদিকেই বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। বাইরের শত্রুরা এই সুযোগে বিজাপুর

আক্রমণের জন্য ঘাঁটি দিয়ে বোসেছিল। এই শত্রুদের ভিতর গোলকুণ্ডা ও বেরার ছিল বিশেষ শক্তিশালী এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ সত্ত্বেও আহমদ-নগর শত্রুতায় কম ছিল না।

সোলতানা ফিরে এসেই এখ্‌লাস খাঁকে উজীরের পদে নিযুক্ত কোরলেন। এই এখ্‌লাস খাঁ অসম-সাহসী বীর পুরুষ ছিলেন। রাজ্য-শাসন বা পরিচালনার কাজে তাঁর বিশেষ দক্ষতা না থাক্‌লেও সোলতানা তাঁকে উজীরের পদে নিয়োগ কোরে-ছিলেন, তার একমাত্র কারণ বহিঃশত্রুর ভয়। তখন অবস্থা যেরূপ দাঁড়িয়েছিল, তাতে এখ্‌লাস খাঁর মত নির্ভীক যোদ্ধার উপর রাজ্যের ভার দেওয়া ছাড়া উপায় ছিলনা।

যা'হোক, এখ্‌লাস খাঁ বীরপুরুষ হোলেও বড় রাজনীতিক ছিলেন না। সুষ্ঠু ভাবে রাজ্য চালাতে হোলে যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি বা কৌশলের প্রয়োজন, তা তাঁর মধ্যে ছিল না। কাজেই সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস তিনি পূরোপূরি পেলেন না।

কিন্তু না পেলেও সোলতানা ভরসা হারালেন না। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অন্য রকমের।

কিছুদিন যেতে না যেতেই গোলকুণ্ডা বেরার ও আহমদনগর সদল বলে এসে বিজাপুর অবরোধ কোরে বোস্‌লো। সোলতানা নগর রক্ষার ভার এখলাস খাঁর উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলেন। এখ্‌লাস খাঁও সে-বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা কোর্‌লেন। তিনি তাঁর আবিসিনীয়া দেশের হাব্‌সী সরদারদের নিয়ে প্রাণপণে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ কোর্‌তে লাগ্‌লেন।

সে সময় বর্ষাকাল। ঝম্ ঝম্ কোরে অবিরাম বৃষ্টি হোচ্ছে। সেই অজস্র বৃষ্টির মধ্যে উভয় দলের সঙ্গীন যুদ্ধ। সে এক অভিনব ব্যাপার! এখ্‌লাস খাঁ প্রাণপণ শক্তিতে যুঝ্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর হাব্‌সী সেনাদলও জীবন-মরণ তুচ্ছ কোরে তাঁকে সাহায্য কোর্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু দেশীয় সৈন্যেরা সেই অফুরন্ত বৃষ্টির মধ্যে কেমন-যেন নাস্ত-নাবুদ হোয়ে পোড়্‌লো। তাদের উৎসাহ

যেন কোমে আস্‌তে লাগ্‌লো। তাদের এই অবস্থা দেখে শত্রুদল মিলিত শক্তি নিয়ে আরও প্রবল আক্রমণ চালাতে লাগ্‌লো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুর্গের এক দিকের পাঁচিল ভেঙে পোড়্‌লো। সোলতানার কাণে যখন এ খবর পৌঁছুল, তখন আর কাল বিলম্ব না কোরে তিনি নাবালক রাজাকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গ-প্রাচীরে এসে উপস্থিত হোলেন এবং সৈন্যদের জ্বলন্ত ভাষায় উৎসাহিত কোরতে লাগ্‌লেন। তাঁর সে উৎসাহ-বাণীতে হতাশ সেনা-দলের মনে যেন নূতন বলের সঞ্চার হোল। তারা দ্বিগুণ উৎসাহে আবার শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ কোর্‌তে লাগ্‌লো।

ঘোর যুদ্ধ হচ্ছে। তারই মাঝে সোলতানার আদেশে ও উৎসাহে রাজমিস্ত্রীরা এসে দুর্গের ভাঙা পাঁচিল মেরামত কোর্‌তে লেগে গেল। তারা যোদ্ধা নয়, হাতিয়ারের সঙ্গে কোন দিনই তাদের পরিচয় নাই, জীবনের ভয়ে তুচ্ছ কোরে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর অস্ত্রের মুখে বোসে তারা দুর্গ-প্রাচীর মেরামত

কোর্‌তে লাগ্‌লো। এমনিই ছিল সোলতানার প্রভাব, এমনিই ছিল তাঁর অগ্নিময়ী বাণী।

আকাশ মেঘে ঢাকা। তা' থেকে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে বজ্রপাত হোচ্ছে, মুষলধারে বৃষ্টি পোড়ছে। তারই মাঝে দুর্গ-প্রাচীরের উপর দৃপ্তা সিংহিনীর মত সোলতানা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যুদ্ধের অবস্থা নিরীক্ষণ কোর্‌ছেন, সৈন্যদের উৎসাহ দিচ্ছেন, নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। কি দুর্জ্জয় সাহস, অদম্য শৌর্য্য, দুর্ব্বার তেজ!

দেখতে দেখতে সেই বৃষ্টির ভিতরেই দুর্গের ভাঙা অংশ মেরামত হোয়ে গেল। সোলতানা কতকটা নিশ্চিন্ত হোলেন।

শত্রুরা দৃঢ় পণ কোরে এসেছিল, যেমন কোরেই হোক, বিজাপুরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত কোরবে। তাই সোলতানার অসীম শৌর্য্য এবং অসাধারণ প্রভাব দেখেও বিচলিত হোল না। তারা আগের মতই আক্রমণ চালাতে লাগালো।

কয়েকদিন পরে সাময়িক ভাবে যুদ্ধ স্থগিত হোল বটে, কিন্তু শত্রুদলের বিজাপুরের দুর্গ সীমান্ত ছেড়ে যাবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তারা তেমনি ভাবেই দুর্গ অবরোধ কোরে বোসে রইল।

এই অবসরে সোলতানা বিক্ষিপ্ত ও হতাশ সেনাদলকে একত্রিত ও উত্তেজিত কোর্‌তে লাগ্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে এখ্‌লাস খাঁর উপর যারা বিরূপ ছিল, তাদেরও দেশের এই দুর্দ্দিনে এক-যোগে শত্রুকে বাধা দেবার জন্য আহ্বান কোরলেন। শত্রুপক্ষের কাণে যখন এ সংবাদ পৌঁছুল, তখন আবার তারা অমিত বলে দুর্গ দখলের জন্য হানা দিল। তাদের ধারণা হোয়ে গিয়েছিল, সোলতানা একবার কোন রকমে যদি বিক্ষিপ্ত এবং বিরূপ সেনাদলকে একত্রিত কোরে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারেন, তাহোলে তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কাজেই তারা সোলতানাকে সে সুযোগ দিল না।

কিন্তু এবারও শত্রুর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হোল। বিজাপুর দুর্গ পূর্ব্বের মতই অনধিকৃত রোয়ে গেল।

এই ভাবে পূরো একটী বছর কেটে গেল। এই এক বছরের ভিতর সাময়িক যুদ্ধ-বিরতির সুযোগে সোলতানা সমস্ত সেনাদলের বিরোধ ও মনোবাদ দূর কোরে একযোগে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলেন। শত্রুসেনা বিজাপুর বাহিনীর সে মিলিত আক্রমণ সহ্য কোরতে পারলোনা। তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে দুর্গ-সীমান্ত পরিত্যাগ কোরে পালিয়ে গেল।

দীর্ঘ এক বৎসর কালের অবরোধের ফলে বিজাপুরের অবস্থা অতীব শোচনীয় হোয়ে উঠেছিল। রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির উদ্ভব হোয়েছিল। যুদ্ধ-শেষে সোলতানার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হোল—হারানো শৃঙ্খলা ও শান্তিকে ফিরিয়ে আনা। সেই কাজেই তিনি মনোনিবেশ কোরলেন। কিন্তু এ কাজে তিনি সহায় কারুকে পেলেন না। কারণ রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলার ভার

থাকে সাধারণতঃ প্রধান উজীরের উপর। কিন্তু উজীর ছিলেন এখ্‌লাস খাঁ। আমরা আগেই বোলেছি, এখ্‌লাস খাঁ সাহসী বীর ছিলেন, রাজনীতিকুশল উজীর ছিলেন না। রাজ্যের শাসন পালন বা শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের কোন অভিজ্ঞতাই তাঁর ছিল না। কাজেই সোলতানাকে একাই এই গুরুতর কাজে হাত দিতে হোল।

যুদ্ধে বহু রক্তপাত, বহু প্রাণনাশ এবং জনসাধারণের বহু আর্থিক ক্ষতি হোয়েছিল। সে সমস্ত ক্ষতির পূরণ হওয়া সামান্য কথা নয়। তবু যতদূর পারা যায়, তার জন্য সোলতানা প্রাণপণে চেষ্টা কোরতে লাগ্‌লেন।

কিছুদিন গত হোলে অবস্থা কতকটা সহজ হোয়ে এল বটে, কিন্তু হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘোটে গেল, যাতে অশান্তি আবার দ্বিগুণ বেড়ে উঠ্‌লো।

এখ্‌লাস খাঁর উপর যারা বিরূপ ছিল, তারা সোলতানার অনুরোধে সাময়িক ভাবে রাগ-দ্বেষ

ভুলে গিয়ে একযোগে মাতৃভূমির রক্ষার জন্য বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কোরেছিল। একটা তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এই সময়ে সেই নিবন্ত রাগ আবার নূতন কোরে জ্বোলে উঠ্‌লো। এখ্‌লাস খাঁর উপর তারা জাতক্রোধ হোয়ে উঠ্‌লো, এবং একদিন সুযোগ বুঝে এক পাষণ্ড ক্ষুরধার অস্ত্র নিয়ে এখ্‌লাসের চোখ দুটো উপড়ে তুলে নিল। এখলাসের অনুরাগী গুণগ্রাহী লোকের অভাব ছিলনা। এই ঘটনায় তারা মরিয়া হোয়ে ক্ষেপে উঠ্‌লো। আবার বিজাপুরের রাজপথে রক্তের স্রোত বোয়ে চোল্‌লো।

এক বিপদ না কাট্‌তে আর এক নূতন বিপদ। সোলতানা মহা বিব্রত হোয়ে পোড়লেন। তবে তাঁর ধৈর্য্য ছিল অসাধারণ, বুদ্ধি ছিল অপরিসীম, রাজনীতিজ্ঞান ছিল অতি সূক্ষ্ম। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত তিনি সকল দিক বজায় কোরতে পারলেন। অনেক কষ্টে উভয় পক্ষকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে সেই ধ্বংসকর বিবাদের অবসান কোরে

দিলেন। ধীরে ধীরে আবার রাজ্যে শান্তি ফিরে এল।

এখ্‌লাসের মৃত্যুর পরে দেলোয়ার খাঁ উজীর হোলেন। এই সময় আহমদনগর ও গোলকুণ্ডার সঙ্গে স্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপন উদ্দেশ্যে ইব্রাহিম আদিল শাহ নিজের ভগিনী খোদায়জা সোলতানাকে মোরতজা নিজাম শাহের পুত্র শাহজাদা হোসেনের সঙ্গে বিবাহ দেন এবং নিজে গোলকুণ্ডা অধিপতি মহম্মদকুলি কুতুব শাহের ভগিনী মনিকা জাহানকে বিবাহ করেন। ফলে এই রাজ্য কয়টীতে বহুদিন-ব্যাপী সুখশান্তি বিরাজ কোরতে থাকে।

———

—পাঁচ—

উপর্যুপরি যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিশৃঙ্খলা, এবং অশান্তির মধ্যে পোড়ে সোলতানার মন যেন অতিষ্ঠ হোয়ে উঠেছিল। তাই কিছুদিনের জন্য নিরিবিলি শান্তি-সুখ উপভোগের জন্য তিনি উদগ্রীব হোয়ে উঠ্‌লেন। বিজাপুরে শান্তি স্থাপিত হোয়েছে দেখে মাতৃভূমি আহমদনগরের কথা তাঁর মনে পোড়ে গেল। সেই শৈশব-কৈশোরের খেলাঘর—অফুরন্ত আনন্দের কেন্দ্র; ভাই বোনের মত বড় আদরের সেই খেলার সাথীরা, বাপ-মায়ের স্নেহের কোল;—সবই একে একে তাঁর মনে পোড়ে গেল।

বহুকাল হোল আহমদনগরের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন কোরে তিনি স্বামীর রাজ্য নিয়ে বিব্রত হোয়ে আছেন। সেখানকার অবস্থা কি, কে কেমন আছে, অনেক দিন পর্য্যন্ত কোন খবরই নেননি, নেবার অবসরও হয়নি। বিজাপুরের চিন্তায় তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হোয়েছিল, অন্য চিন্তার প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত সেখানে ছিলনা। আজ অবসর হোয়েছে। তাই, সেই পুরানো দিনের সকল সুখ-স্মৃতি হঠাৎ এক সঙ্গে জেগে উঠে তাঁর মনটাকে আকুল কোরে তুল্‌লো। আহমদনগরের কোলে গিয়ে নিশ্চিন্ত শান্তি লাভের জন্য তিনি অতি-মাত্রায় ব্যাকুল হোয়ে উঠলেন।

কিন্তু সোলতানার ভাগ্যে বিধাতা শান্তি লিখেন নাই। আহমদনগরে যাওয়ার জন্য তিনি তৈরী হোয়েছেন, এমন সময়ে সেখান থেকে এক নিদারুণ দুঃসংবাদ এল। সোলতানার বুকখানা ফেটে বুঝি চৌচির হোয়ে গেল।

আমরা যে সময়ের কথা বোলছি, তার বহু আগে সোলতানার পিতা আহমদনগরের সোলতান হোসেন নিজাম শাহ ও সোলতানার ভ্রাতা মোরতজা শাহের মৃত্যু হোয়েছিল। মোরতজার মৃত্যুর পর সোলতান মিরণ হোসেন তাঁর মন্ত্রী মির্জ্জাখানের দ্বারা নিহত হন। তারপর সোলতান এসমাইল ও সোলতান বোরহান কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করার পর মারা গেলে এবরাহিম নিজাম শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু রাজ্য পরিচালনায় বা শাসনে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁর সেই অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কুচক্রীগণ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। এই ষড়যন্ত্রের মূলে ছিলেন উজীর মিঞা মঞ্জু। এই মিঞা মঞ্জু সামান্য শিক্ষকরূপে আহমদনগরে প্রবেশ করেন। ক্রমে তিনি মরহুম সোলতান হোসেন নিজাম শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে দরবারে প্রবেশাধিকার পান। কূটবুদ্ধি বা কৌশলের অভাব মিঞা মঞ্জুর মধ্যে ছিলনা এবং তারই বলে তিনি ক্রমে ক্রমে

প্রধান উজীরের মর্য্যাদা ও গৌরব লাভ করিতে সক্ষম হন।

সোলতান হোসেন ও মোরতজা নিজাম শাহ যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন মিঞা মঞ্জু কোন বিরুদ্ধাচরণ বা ষড়যন্ত্র কোর্‌তে পারেননি। কারণ, তাঁরা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন লোক ছিলেন। সকল দিকেই তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল, সকলেরই গতিবিধি তাঁরা লক্ষ্য কোরতেন। কাজেই মিঞা মঞ্জু তাঁর কূট নীতি চালাতে পারেন নি সোলতান বোরহানের মৃত্যুর পর যখন অনভিজ্ঞ ইবরাহিম সিংহাসনে আরোহণ কোরলেন, তখন তিনি ভিতরে ভিতরে চক্রান্ত কোরে একটা শক্তি-শালী দল গঠন কোরে ফেললেন।

সোলতান ইবরাহিম নিজাম শাহ নামে মাত্র সোলতান। সোলতানাতের কোন সংবাদই তিনি রাখতেন না। রাত্রিদিন ছত্র মঞ্জিলে পোড়ে কতক-গুলো উচ্ছৃঙ্খল অকর্ম্মণ্য চাটুকারকে নিয়ে আমোদের ফোয়ারা ছুটাতেন, স্ফূর্ত্তির আতসবাজী ফুটাতেন।

অবশ্য মিঞা মঞ্জু তাঁকে এই প্রলোভনের সমুদ্রে এনে ফেলেছিলেন, নইলে যে তাঁর মতলব হাসেল হয় না। তাঁর কড়া হুকুমে ইয়ার মোসাহেব ছাড়া ছত্রমঞ্জিলে কারো প্রবেশের অধিকার ছিল না। রাজ্যের কোন সংবাদই কেউ তাঁকে দিতে পারতনা। যে দিত, মিঞা মঞ্জুর হুকুমে তার কাঁধে মাথা থাকৃত না। কাজেই ইচ্ছা থাকৃলেও প্রাণের ভয়ে কেউ ছত্র মঞ্জিলের ধার দিয়েও যেতে চাইত না।

উজীরের ইচ্ছ ছিল, সোলতান ইবরাহিমের মৃত্যু হোলে নিজেই সিংহাসন দখল কোরে বোস্‌বেন। কিন্তু কার্য্যকালে অতটা পেরে উঠলেন না। সোলতান ইব্রাহিমের যখন মৃত্যু হোল, তখন তিনি ভেবে চিন্তে দেখলেন হঠাৎ অতদূর না এগিয়ে অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তাই এবরাহিমের পুত্র বাহাদুরকে বন্দী কোরে আহমদ নামে ৭ বৎসরেয় এক ভিন্ন বংশীয় বালককে নামে মাত্র সিংহাসনে বসিয়ে তিনি

সকল ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিলেন। রাজার পক্ষের এবং উজীরের বিরুদ্ধ দলের লোক যারা রাজধানীতে ছিল, এই ব্যাপারে তারা একেবারে হতবুদ্ধি হোয়ে পোড়লো। প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস বা শক্তি তাদের ছিল না। কারণ, রাজশক্তি উজীরের মুঠোর মধ্যে তার বিরুদ্ধে কথা বোললে কাঁধে মাথা থাক্‌বেনা। তাই নিরুপায় হোয়ে তারা চাঁদরাণীর শরণাপন্ন হোল। অতি গোপনে বিশ্বস্ত লোকের মারফৎ তারা বিজাপুরে সংবাদ পাঠাল।

এই সমস্ত দুঃসংবাদ শুনে সোলতানা একেবারে মর্ম্মাহত হোয়ে পোড়লেন। যে আড়ম্বর সমারোহের সঙ্গে তিনি পিতৃরাজ্যে যাবেন বোলে সঙ্কল্প কোরেছিলেন, তা পরিত্যাগ কোরলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র কোরে দিলেন, উপস্থিত আহমদ-নগর যাওয়ার আশা তিনি ত্যাগ কোরলেন। কিন্তু ভিতরের কথা কারো কাছে প্রকাশ কোরলেন না।

সেই দিন রাত্রে রাজা ইব্রাহিম আদিল শাহকে নিভৃতে ডেকে তিনি গোপনে আহমদনগরে যাবার সঙ্কল্প প্রকাশ কোরলেন। রাজা ইব্রাহিম আদিল শাহ সে সময়ে সাবালক হোয়েছিলেন, ইদানীং সোলতানা রাজ্য বা রাজনীতি সংক্রান্ত সমস্ত গুরুতর ব্যাপারেই তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা কোরতেন।

সোলতানার সঙ্কল্প শুনে রাজা বিশেষ চিন্তিত হোয়ে পোড়লেন। আহমদনগরের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ, তাতে তাকে শত্রুপুরী ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সেই শত্রুপুরীতে অসংখ্য বিপদের মুখে তিনি সোলতানাকে একক কেমন কোরে ছেড়ে দেবেন ?

রাজাকে নীরব দেখে সোলতানা তাঁকে ভরসা দিতে লাগলেন। কিন্তু রাজা কিছুতেই ভরসা পেলেন না। তিনি বোল্‌লেন, "যদি তারা আপনাকে আটক করে, প্রয়োজন বুঝ্‌লে হয়ত হত্যার চেষ্টাও কোর্‌তে পারে, তাহোলে কেমন কোরে আপনি

আত্মরক্ষা কোরবেন। রাজ্য মধ্যে যখন এত দলাদলি, বিদ্রোহ ও অরাজকতা তখন সেখান থেকে আপনি বেঁচে আস্‌বেন কেমন কোরে ?

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আলোচনা হোল। শেষ পর্য্যন্ত এই স্থির হোল, পরদিন রাত্রিতে ভীমা নদীর এপারে বিজাপুরের সৈন্য মোতায়েন থাক্‌বে, আর সোলতানা কয়েকজন দুর্দ্ধর্ষ সাহসী দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে নদী পার হেয়ে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ কোরে আহমদনগর চোলে যাবেন। প্রত্যূষের পূর্ব্বে নদীর এপারে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হবে যদি কোন সংবাদ না পৌঁছায় তাহোলে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিজাপুর-বাহিনী নদী পার হোয়ে অহমদনগর আক্রমণ কোরবে।

সেই রাত্রিতেই সোলতানা একজন বিশ্বাসী বাঁদীকে ডেকে ছদ্মবেশ ঠিক রাখতে বোললেন। যা'তে কেউ চিন্‌তে না পারে, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি ছদ্মবেশে অহমদনগরে যাওয়া সমীচীন

মনে কোরলেন। বহুকাল পর্য্যন্ত আহমদ-নগরের লোক তাঁকে দেখেনি। স্বাভাবিক বেশে গেলেও হঠাৎ তাঁকে কেউ চিন্‌তে পারবে না। তার উপর যদি ছদ্মবেশ পরেন, তাহোলে ত কথাই নাই।

পরদিন সূর্য্যাস্তের পর যখন সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল, তখন একদল সুশিক্ষিত, অশ্বারোহী সেনা বিজাপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে বেরিয়ে ভীমা নদীর দিকে অগ্রসর হোল। জনসাধারণ এ বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানে না। কাজেই হঠাৎ এই অভিযান দেখে তারা ভয় খেয়ে গেল। আবার কি যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হোল? ক্রমাগত লড়াই ফসাদের ফলে তাদের মনে এরূপ আশঙ্কা হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। তারা পরস্পরে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা কোরে কারণ জান্‌তে চাইল, কিন্তু কেউই কোন উত্তর দিতে পারলোনা। তাদের মনের সংশয় মনেই থেকে গেল।

সৈন্যদল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ভীমার তীরে শিবির সন্নিবেশ কোর্‌লো। রাত্রি এক প্রহরের সময় সোলতানা দেহরক্ষীদের নিয়ে নদী অতিক্রম কোরে দ্রুত অশ্বারোহণে আহমদনগরের পথে যাত্রা কোরলেন।

———

—ছয়—

আহমদনগরের অবস্থার কথা আমরা আগেই বোলেছি। রাজ্য অরাজক, লুঠ-তরাজ, খুন-ডাকাতি হানাহানি যথেচ্ছা চোল্‌ছে। কেউ দেখবার নেই, প্রজারা সকলেই সন্ত্রস্ত, কখন্ কার সর্ব্বনাশ হয়। এমনি অবস্থার ভিতর পোড়ে নিজামশাহী বংশের গৌরবময় নাম লুপ্ত হোতে বোসেছে। বড় আশা কোরে রাজ-পক্ষ চাঁদরাণীর কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছিল, সে আশায়ও ছাই পোড়লো। তবে আর এ বিপদে কে উদ্ধার কোরবে।

কিন্তু রাজ্যের এই অরাজকতা এবং রাজধানীর অরক্ষিত অবস্থাই সোলতানাকে আহমদনগরে প্রবেশের সুযোগ কোরে দিল। গভীর রাত্রিতে নগর সীমান্তে অশ্ব এবং অন্যান্য দেহরক্ষীদের রেখে মাত্র দুইজন দেহরক্ষী নিয়ে ছদ্মবেশে পায়ে হেঁটে যখন তিনি নগরে প্রবেশ কোরলেন, তখন সমস্ত নগরী ঘুমের কোলে ঢোলে পোড়েছে, নামে মাত্র প্রহরী যে দু'একজন জেগে ছিল, তারাও তাঁদের সাধারণ নাগরিক ভেবে কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরলে না। সোলতানা সরাসরি রাজপুরীতে না গিয়ে মহম্মদ খাঁর বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লেন।

এই মহম্মদ খাঁ আহমদ নগর রাজবংশের অতি বিশ্বাসের পাত্র। সুদিনে দুর্দ্দিনে বিপদে আপদে সকল সময়েই ইনি নিজাম শাহী বংশের সুনাম ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণপণ কোরে এসেছেন। সেই জন্য বহুকাল দেখা সাক্ষাৎ না থাক্‌লেও তাঁর প্রতি সোলতানার বিশ্বাস অটুট ছিল। দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির

ফলে যারা মিত্র ছিল, তারা হয়ত এখন শত্রু হোয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের কাছে যাওয়া নিরাপদ নয়। কিন্তু মহম্মদ খাঁর গৃহ নিজাম শাহী বংশের কন্যার জন্য সব সময়েই নিরাপদ। তাই সোলতানা অন্য কোথায়ও না গিয়ে মহম্মদ খাঁর বাড়ীতে গিয়েই উঠ্লেন। প্রহরী নিজাম শাহী বংশের সাঙ্কেতিক অঙ্গুরী দেখে সসম্ভ্রমে দ্বার ছেড়ে দিল। সোলতানা নির্ব্বিঘ্নে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোরলেন।

মহম্মদ খাঁ তখনও ঘুমোননি। চাঁদরাণী আহমদ নগরে আস্‌বেন না, এ সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন। পেয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। ঘুম তাঁর চোখ থেকে বহুদূরে সোরে গিয়েছিল। তিনি ভাব্‌ছিলেন, নিজে একবার গোপনে বিজাপুর গিয়ে চাঁদরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরবেন কি না। তিনি না হোলে নিজাম শাহী বংশকে ধ্বংসের মুখ থেকে কেউ রক্ষা কোরতে পারবে না।

ঠিক সেই সময়ে সোলতানা দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোরলেন। ছদ্মবেশ থাক্‌লেও

সোলতানাকে চিনে নিতে মহম্মদ খাঁর মুহূর্ত্তকালও দেরী হোল না। তাঁর মলিন মুখ খানি এক নিমিষে আনন্দে উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌লো। মহামান্যা অতিথিকে তখনই তিনি সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা কোরে বসালেন।

ক্রমে ক্রমে মহম্মদ খাঁ রাজার কথা, রাজ্যের কথা, মিঞা মঞ্জুর কথা—সব কথাই সোলতানাকে খুলে বোল্লেন। এবং এ-ও বোল্লেন, সোলতানা যদি একবার আমিরদের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ান, দু'টো কথা তাদের বুঝিয়ে বলেন, তাহোলে এক মুহুর্ত্তে আহমদনগর থেকে এই দূষিত আবহাওয়া দূর হোয়ে যাবে।

সোলতানা অনেকক্ষণ ধোরে কথাটা ভাব্‌লেন। শেষে বোল্লেন, এতে স্থায়ী ফল হবে না। দু'দিন পরে আমি যখন চোলে যাব, তখন আবার হয়ত এই পাপ চক্রান্ত আরম্ভ হবে। তার চেয়ে মিঞা মঞ্জুকে শাস্তি দেওয়াই আমি যুক্তিসঙ্গত বোলে মনে করি, তা হোলেই আগুণ একেবারে নিভে

যাবে। কিন্তু তা' কোরতে যুদ্ধের প্রয়োজন হবে। কারণ, মিঞা মঞ্জু ত' এম্‌নিই আত্মসমর্পণ কোরবে না।

মহম্মদ খাঁ কথাটা বুঝ্‌লেন। বুঝে বোল্লেন যুদ্ধের আয়োজন কোরতে কোরতেও সময়ের প্রয়োজন। সেই সময়ের মধ্যে যদি—

সোলতানা বাধা দিয়ে বোল্‌লেন, আমি প্রত্যূষেই আপনাদের রাজধানী আক্রমণ কোর্‌তে প্রস্তুত আছি। যদি আপনারা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

মহম্মদ খাঁ বিস্মিত হোয়ে জিজ্ঞাসা কোরলেন, আপনি কি প্রস্তুত হোয়ে এসেছেন?

সোলতানা উত্তর দিলেন, হাঁ প্রস্তুত হোয়েই এসেছি। বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ভীমার তীরে অপেক্ষা কোরছে। আপনাদের ইঙ্গিত পেলেই আমি আক্রমণ কোরতে পারি।

মহম্মদ খাঁ যেন হাতে চাঁদ পেলেন। আনন্দে উৎফুল্ল হোয়ে বোললেন, আমি এখনই দুর্গাধ্যক্ষকে

ডেকে আপনাকে পাকা কথা বোলে দিচ্ছি, ততক্ষণ আপনি বিশ্রাম করুন।

সোলতানার বিশ্রামের ব্যবস্থা কোরে দিয়ে মহম্মদ খাঁ, জিতা খাঁকে ডাক্‌তে লোক পাঠালেন।

জিতা খাঁ দাক্ষিণাত্যের নামজাদা যোদ্ধা। তাঁর বীরত্বের কাহিনী সারা দক্ষিণ ভারতে রূপ-কথার গল্পের মত প্রচলিত ছিল।

চাঁদরাণীর কথা যখন তাঁর কাণে গিয়ে পৌঁছুল, তখন আর তিনি স্থির থাক্‌তে পারলেন না। খবর পাওয়া মাত্রই মহম্মদ খাঁর বাড়ীতে ছুটে এলেন, তাঁর বড় আদরের চাঁদরাণীকে দেখ্‌তে। দেখে আনন্দে তাঁর বুকখানা যেন ফুলে উঠ্‌লো। সোল-তানাকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কোরে কুশল জিজ্ঞাসা কোরলেন। সোলতানাও সসম্ভ্রমে তাঁকে অভিবাদন কোরে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন।

মহম্মদখাঁর আহ্বানে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট আমীর এসে সোলতানার সঙ্গে দেখা কোরলেন।

সকলে মিলে আলোচনা হোল। অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্য্যন্ত সকলেই সোলতানার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। প্রভাতে আক্রমণ করাই স্থির হোল।

কথাবার্ত্তা শেষ কোরে সকলে নিজের নিজের কর্ত্তব্যে চোলে গেলেন। সোলতানা দেহরক্ষী ছুজনকে ভীমার তীরে সংবাদ পৌঁছবার জন্য পাঠিয়ে অবশিষ্ট রাত্রিটুকুর জন্য বিশ্রামে অবসর নিলেন।

সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে আহমদনগরের নাগরিকেরা এক আজব খবর শুন্‌লো। বিজাপুরী সৈন্য আহমদনগরের সীমান্তে এসে পোড়েছে। এখনই তারা নগর আক্রমণ কোরবে। খবরটা শুনে কেউ বা 'সু' কেউ বা 'কু' ভাব্‌লো। কেউ বোল্‌ল, মিঞা মঞ্জুকে শাস্তি দেবার জন্য চাঁদরাণী এই ব্যবস্থা কোরেছেন, আবার কেউ বোল্‌ল, না হে না, বাপের রাজ্যটা আর আলাদা থাক্‌বে কেন। নিজের রাজ্যের সঙ্গে এক কোরে নেবার জন্যই এই ব্যবস্থা কোরেছেন।

তার উত্তরে বোলে পাঠালেন, একটী মাত্র সর্ত্তে সন্ধি হোতে পারে, সে সর্ত্ত হোল মিঞা মঞ্জুর আত্মসমর্পণ।

দূত আবার ফিরে এল। সংবাদ দিল—মিঞা মঞ্জু তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ কোরবেন।

যুদ্ধ স্থগিত হোল। কিন্তু বিজাপুরী সেনাদল নগর-সীমান্ত পরিত্যাগ কোরলোনা। সোলতানার আদেশ—যতক্ষণ পর্য্যন্ত মিঞা মঞ্জু আত্মসমর্পণ না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটী পদাতিকও যেন বিজাপুরে না ফিরে যায়।

পরদিন দরবার বোস্‌লো। বন্দী বাহাদুরকে মুক্ত কোরে সিংহাসনে এনে বসান হোল। তাঁরই পাশে ভিন্ন আসনে সোলতানা আসন গ্রহণ কোরলেন। মিঞা মঞ্জুকে তাঁর সামনে এনে হাজির করা হোল। সে অপরাধীর মত নত মস্তকে সোলতানার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রইল।

সোলতানা সমবেত আমীর ওমরাদের উদ্দেশ কোরে জিজ্ঞাসা কোরলেন, এই উজীর মিঞা মঞ্জুর

বিরুদ্ধে আপনাদের কার কি অভিযোগ আছে, বলুন।

তখন তার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ উঠ্‌লো, তা' শুনে দরবারের লোকজন এমন কি সোলতানা নিজে পর্য্যন্ত শিউরে উঠ্‌লেন। অভিযোগ প্রমাণও হোয়ে গেল!

তখন সোলতানা উপস্থিত সকলের নিকট বিচার-প্রার্থী হোলেন।

ঠিক সেই সময় মিঞা মঞ্জু আর্ত্তস্বরে চীৎকার কোরে বোলে উঠ্‌লো, ক্ষমা কর মা, আমার অপ-রাধ ক্ষমা কর, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোয়েছে।

সোলতানা হাজার হোলেও নারী। তাঁর হৃদয় স্নেহ-মমতায় কোমল। অপরাধী মিঞা মঞ্জুর এ কাতরোক্তি তিনি উপেক্ষা কোর্‌তে পারলেন না। তাকে ক্ষমা কোরলেন—তবে একটা কঠিন সর্ত্তে। মিঞা মঞ্জুর হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হবে এবং তাকে আহমদনগর পরিত্যাগ কোরে বিজাপুরে বসবাস কোরতে হবে।

সোলতানার এ বিচারে সকলেই একরকম সন্তুষ্ট হোল। হোলেন না কেবল মহম্মদ খাঁ আর জিতা খাঁ। তাঁরা মিঞা মঞ্জুকে ভাল কোরে চিন্‌তেন। অদূর ভবিষ্যতে সে যে আবার কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বোস্‌বে না, একথা কে বোল্‌তে পারে? কিন্তু তাঁদের অসন্তোষ মনের মধ্যেই চাপা রইল। রাণীর সাম্‌নে আর প্রকাশ কোরলেন না।

এর পর সোলতানা নাবালক সোলতান বাহাদুরের প্রতিনিধি হোয়ে আহমদনগরেই অনেক দিন রোয়ে গেলেন। যখন সকল দিকের সুবন্দোবস্ত হোয়ে গেল, তখন কিছু দিনের জন্য তিনি বিজাপুর যাত্রা কোরলেন। তাঁর নির্দ্দেশ অনুসারে আহমদ নগরের উজীরির ভার মহম্মদ খাঁর উপরেই পোড়্‌লো।

———

—সাত—

উভয় রাজ্যেই শান্তি স্থাপিত হোল দেখে সোলতানা কিছুদিনের জন্য রাজকার্য্য থেকে অবসর নিলেন। অন্তঃপুরের নিরালায় বোসে লেখা পড়ায় ও ছবি-আঁকায় মনোযোগ দিলেন। মাঝে মাঝে শিকারেও যেতে লাগলেন। শিকার কোরতে তিনি অত্যন্ত ভালবাস্‌তেন। যৌবনের প্রথম থেকে স্বামীর সঙ্গে শিকারে বেরিয়ে এ অভ্যাস তিনি বদ্ধমূল কোরে ফেলেছিলেন। কাজেই সংসার-জীবনের বা রাজ্য-চালনার নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বিপর্য্যস্ত হোয়েও এ অভ্যাসকে তিনি ত্যাগ কোর্‌তে

পারেননি। তাই সময় ও সুযোগ পেলেই তিনি সৈন্য সামন্ত নিয়ে অশ্বারোহণে দূর দূরান্তের পাহাড়-জঙ্গলে শিকারে বেরুতেন।

সোলতানা যখন শিকারে বেরুতেন, তখন শিক্ষিত কুকুর, চিতা বাঘ, বাজ পাখী প্রভৃতি সঙ্গে নিতেন। তারা কেমন কোরে শিকার ধরে, দেখতে তিনি বড়ই পছন্দ কোর্‌তেন এবং দেখে মনে মনে যথেষ্ট আমোদ অনুভব কোরতেন। তাঁর এই শিকারের ধারা সে-যুগের প্রায় সকল রাজা-রাজড়ারাই অনুকরণ কোরতেন।

এই ভাবে নিশ্চিন্ত অবসরে কিছুদিন কেটে গেল। হঠাৎ একদিন খবর এল মোগল-সম্রাট আকবর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য তাঁর বিপুল বাহিনী দিল্লী থেকে রওয়ানা কোরে দিয়েছেন। তারা প্রথমেই এসে আহমদনগর অক্রমণ কোরবে। রাণী বুঝ্‌লেন, বিধাতা তাঁর কপালে শান্তি-সুখ লেখেন নাই। কিন্তু তিনি ভেবে স্থির কোর্‌তে পারলেন না, মোগল-সম্রাটের এই অস্বাভাবিক রাজ্য-লোলুপতা

চাঁদ সোলতানা

কেন ? তিনি রাজত্ব কোরছেন সুদূর দিল্লীতে, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত তাঁর দখলে। তবে দাক্ষিণাত্যের এই ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যগুলো জয় করবাব জন্য তাঁর এত আগ্রহ কেন ?

যাহোক, সোলতানা আর নিশিন্ত অবসরে সময় কাটাতে পারলেন না আবশ্যক আয়োজন করবার জন্য তিনি অল্প কয়েক দিন পরেই পুনরায় আহমদ-নগর যাত্রা কোরলেন। যাবার সময় সোলতান ইবরাহিম আদিল শাহকে মোগল-যুদ্ধে ধন প্রাণ দিয়ে আহমদ নগরের সাহায্য করবার জন্য অনুরোধ কোরে গেলেন।

মোগল-সৈন্যের এই দাক্ষিণাত্য অভিযানের মূলে ছিল বিশ্বাসঘাতক উজীর মিঞা মঞ্জুর প্ররোচনা। সে তার অপমানের কথা ভুলতে পারেনি। তাই প্রতিশোধ নেবার জন্য গোপনে গোপনে মোগলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র কোরছিল। সে মোগলকে এই সর্ত্তে রাজী কোরেছিল যে, তারা যদি আক্রমণ করে, তাহোলে সর্ব্বপ্রকারে সে মোগলকে সাহায্য

কোরবে এবং যাতে তারা জয়লাভ কোরতে পারে, তার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কোরবে। মোগল মিঞা মঞ্জুর কথায় বিশ্বাস কোরেই এই দুরূহ কাজে হস্তক্ষেপ কোরেছিল।

সোলতানাকে হঠাৎ আহমদনগরে উপস্থিত হোতে দেখে মিঞা মঞ্জুর দলের ষড়যন্ত্রীদের বুক অনেকখানি দোমে গেল। মোগল-সংঘর্ষে সোলতানা যে যোগ দেবেন, এটা তারা ভাল কোরেই জান্‌তো, কিন্তু এত শীঘ্র যে তিনি সংবাদ পেয়ে আহমদনগরে এসে উপস্থিত হবেন, এটা তারা কল্পনাও কোর্‌তে পারেনি। তার উপর তাদের নিজের ষড়যন্ত্রের কথা যদি প্রকাশ হোয়ে থাকে, তা হোলে ত আরো বিপদ। কাজেই তারা বেশ-একটু ঘাব্‌ড়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন জান্‌লো, মোগলের অভিযানের খবর সোলতানা পেয়েছেন বটে, কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই জান্‌তে পারেননি, তখন একটু ভরসা পেল।

আহমদনগরে পৌঁছে সোলতানা মোগলের

গতিরোধ করবার জন্য সাধ্যমত আয়োজন কোর্‌তে লাগ্‌লেন। চারদিকে সাজ সাজ রব পোড়ে গেল। সোলতানার উপস্থিতিতে সমগ্র রাজ্যে যেন নূতন জীবনের সঞ্চার হোল। সৈন্যেরা দ্বিগুণ উৎসাহে মোগলের সম্মুখীন হবার জন্য বদ্ধপরিকর হোল। আর মহম্মদ খাঁ, জিতা খাঁ—এঁদের ত কথাই নাই।

যথাকালে মোগল, শাহজাদা মোরাদের নেতৃত্বে আহমদনগরের দোরে এসে পৌঁছুল। কিন্তু এসে যে রণসজ্জা দেখ্‌ল, তাতে তারা যা ধারণা কোরে এসেছিল, তার ঠিক বিপরীত হোল। ক্ষুদ্র আহমদনগরের পক্ষে এরকম বিপুল আয়োজন সম্ভব, এ তারা কল্পনাও কোর্‌তে পারে নি।

যখন যুদ্ধ বাধ্‌লো, সোলতানা স্বয়ং ঘোড়ার পিঠে মুক্ত তরবারি হস্তে নিজামশাহী বাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তাদের চালনা কোরতে লাগ্‌লেন। সে দৃশ্য দেখে মোগল-বাহিনী স্তম্ভিত হোয়ে গেল। এমন অপরূপ দৃশ্য তারা আর কখনও দেখেনি।

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হোল। উভয় পক্ষই শক্তিমান, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাজেই জয় পরাজয় কিছুই নির্ণয় হোল না। সমস্ত দিনের অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিরতির নিশান উড়লো। উভয় দলই নিজের নিজের শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিল।

পরদিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হোল। এদিনের অবস্থাও পূর্ব্ব দিনের মত হোল। কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয় নির্ণয় হোল না।

এইভাবে দিনের পর দিন ধোরে ক্রমাগত একমাস কাল যুদ্ধ কোরেও মোগল-বাহিনী ক্ষুদ্র আহমদনগরকে পরাজিত কোরতে পারলো না। শেষে বর্ষা এসে পড়ায় বাধ্য হোয়ে তারা দিল্লীর পথে ফিরে গেল।

সোলতানা মনে কোরলেন, এতদিনে বুঝি সত্য সত্যই শান্তি স্থাপিত হোল। কিন্তু তাঁর ধারণা ভুল। মোগল-সম্রাটের বুকে এ পরাজয় শেলের মত এসে বিঁধলো। এক বৎসর যেতে না যেতেই তিনি আগের চেয়ে দ্বিগুণ সৈন্য দিয়ে

পুত্র দানিয়ালকে পাঠিয়ে দিলেন—আহমদনগর ধ্বংস কোর্‌তে। তার সঙ্গে এলেন সেনাপতি খান খানান।

এবার যে যুদ্ধ হোল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মহাসমুদ্রের মত বিপুল মোগল-বাহিনী এসে যখন ক্ষুদ্র আহমদনগরকে ঘিরে ফেল্‌লো, তখন তুলনায় মুষ্টিমেয় সৈন্যদল নিয়ে চাঁদ সোলতানা তাঁদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। একবার মোগল এই বীরনারীর বীরত্ব দেখে গেছে। শত মুখে তার প্রশংসা কোরেছে। আবার সে-ই এসে দাঁড়িয়েছে তাদের সম্মখে—তাদের প্রচণ্ড শক্তির গতিরোধ কোরে। কিন্তু এবার আর মোগল নারীর কাছে পরাজিত হোয়ে অপমানের কালিমা মেখে ফির্‌তে আসেনি, এবার এসেছে জীবন-মরণ পণ কোরে।

যুদ্ধ আরম্ভ হোল। কোলাহল-কলরোলে, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায়, অশ্বের হ্রেষায় আকাশ পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌লো। মৃত্যু যেন চারদিকে লোল জিহ্বা

বিস্তার কোরে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো। সেই মরণের মুখে শ্বেত অশ্বে আরোহণ কোরে দৃপ্তা সিংহিনীর মত সোলতানা সৈন্য চালনা কোরতে লাগ্‌লেন——অকুতোভয়ে—অসীম সাহসে।

ক্রমাগত কয়েকদিন ধোরে যুদ্ধ চলার পর আহমদনগরের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা একে একে মৃত্যু বরণ কোরে নিল। তারা ছিল সোলতানার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। তাদের মৃত্যুতে সোলতানার বুকখানা শতখণ্ডে ভেঙে চুরমার হোয়ে গেল। সবই যখন গেল, তখন আর কার জন্য যুদ্ধ! তিনি সন্ধির প্রস্তাব কোরে শাহজাদা দানিয়ালের কাছে দূত পাঠালেন।

শাহজাদা দানিয়াল সোলতানার অদ্ভুত বীরপণা দেখে মুগ্ধ হোয়েছিলেন। তাই তাঁর অনুরোধ তিনি উপেক্ষা কোরতে পারলেন না। সন্ধির প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে তিনি সোলতানার কাছে দূত পাঠালেন। যুদ্ধ স্থগিত হোল।

কিন্তু সোলতানার এত চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ

হোয়ে গেল। তাঁর এই সন্ধির প্রস্তাব কতকগুলি দুষ্টবুদ্ধি লোকের মনে দারুণ সন্দেহের সঞ্চার কোর্‌লো। তারা বুঝ্‌লো না, সোলতানা তাদের কল্যাণের জন্য মোগলের সঙ্গে সন্ধি কোরেছেন। উপরন্তু মনে মনে স্থির বিশ্বাস কোর্‌লো যে সোলতানা আহমদনগরের গৌরব-গরিমাকে পথের ধূলোয় লুটিয়ে দিলেন। তারা প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা কোরে জিতা খাঁর নেতৃত্বে সোলতানার বিরুদ্ধে অভিযান কোর্‌লো। সোলতানাও বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কোর্‌তে লাগ্‌লেন। এতে বিদ্রোহী দল আরো উত্তেজিত হোয়ে উঠ্‌লো এবং একদিন সুযোগ বুঝে তারা সোলতানার বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ কোরে নিঃসহায় অবস্থায় তাঁকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা কোরলো।

দক্ষিণী মুসলমানের বিজয়-গৌরব, ভারত নারীর জীবন্ত আদর্শ চিরকালের জন্য এই ভাবে অতল সাগরে মিলিয়ে গেল।

নূরজাহান

নূরজাহান

—এক—

বেগম নূরজাহানের নাম শোনেনি, এমন লোক তুনিয়ায়—বিশেষ কোরে ভারতবর্ষে কেউ আছে কিনা সন্দেহ। সৌন্দর্য্য, প্রতিভা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তেজোগৌরবে তাঁর মত নারী ভারতে দ্বিতীয় কেউ এসেছিলেন বোলে মনে হয় না। সাধারণ ঘরে সাধারণ বংশে সামান্য অবস্থার ভিতরে জন্ম নিয়ে কেমন কোরে তিনি এই আসমুদ্র ভারতের দণ্ড-মুণ্ডের বিধাত্রী হোয়েছিলেন, এইবার সেই কথাই আমরা বোল্‌বো।

ইরাণ দেশের তেহরান নগরে গিয়াসবেগ নামে একজন ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বাস কোরতেন।

তাঁর অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল ছিলনা। সামান্য অবস্থার ভিতরে থেকে কোন রকমে দিনপাত কোরতেন। কিন্তু তাঁর মনে উচ্চাশা খুব প্রবল ছিল। যেমন কোরেই হোক অবস্থার পরিবর্ত্তন কোরবো, একটা মানুষের মতন মানুষ হব—এই ছিল তাঁর অন্তরের কামনা এবং এই কামনাকে ফলবতী করবার জন্য তিনি সারা জীবন ধোরে সংগ্রাম কোরে আস্‌ছিলেন। তাঁর এই উঁচু আশা—বড় হওয়ার সাধ এবং তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা—এসব কিন্তু তাঁর প্রতিবেশীদের কাছে আদৌ ভাল ঠেক্‌তোনা। সাধারণ লোকে যেমন অল্পেতেই সন্তুষ্ট হোয়ে থাকে, অসম্ভব রকমের আশা পোষণ করেনা এবং তার জন্য প্রাণপণ সংগ্রামও কোরতে চায় না, তারা ছিল সেই প্রকৃতির লোক। কাজেই গিয়াসবেগের এই সাধ, আশা বা প্রচেষ্টা তাদের কাছে কেমন যেন বিসদৃশ ঠেক্‌তো, এবং সেই জন্য তারা তাঁকে বিশেষ ভাল চোখে দেখ্‌তোনা। গিয়াসবেগ কিন্তু তাদের এই অসন্তোষে ভ্রূক্ষেপও কোরতেন না। তিনি আপন

মনে নিজের কাজ কোরে যেতেন, কে ভাল বোল্‌ছে বা কে মন্দ বোল্‌ছে, সে-সব দেখবার কোন দরকার আছে বোলে তিনি মনে কোরতেন না।

জন্মভূমির বুকে গিয়াসবেগের দিনগুলো এমনি ভাবেই কেটে চোলেছিল, কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে যেখানে বাস কোরতে হয়, সেখানে পাঁচজনের একজন হোয়ে না থাক্‌লে মানুষ টিঁক্‌তে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত গিয়াসবেগও পারলেন্ না। তাঁর উপর প্রতিবেশীদের অসন্তোষের আগুণ ধোঁ-য়াতে ধোঁয়াতে ক্রমে জ্বোলে উঠ্‌লো, এবং শেষকালে এমন হোয়ে দাঁড়াল যে, দেশে বাস করা তাঁর পক্ষে ভার হোয়ে উঠ্‌লো। প্রতিবেশীরা সুযোগ পেলেই ছুতা-নাতায় তাঁকে অপমান কোর্‌তে লাগ্‌লো। প্রথম প্রথম গিয়াসবেগ নির্ব্বিকারের মত সেগুলো এড়িয়ে চোল্‌তে লাগ্‌লেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অত্যাচারের মাত্রা যখন অতিরিক্ত রকমে বেড়ে উঠ্‌লো, তখন আর পেরে উঠ্‌লেন না। দুষ্ট এবং দুর্ম্মুখ প্রতিবেশীদের সংশ্রব

ত্যাগ করাই তিনি যুক্তিসঙ্গত বোলে মনে কোরলেন।

কিন্তু কোথায় যাবেন! বড় সাধের জন্মভূমি, পিতৃপিতামহের ভিটা, বিষয় সম্পত্তি এসব ছেড়ে কোথায় যাবেন—কোন্ অজানা দেশে—অপরিচিত আবহাওয়া ও আবেষ্টনীর মাঝে! সেখানকার লোক যদি আরও বেশী অত্যাচারী, আরও বেশী দুষ্ট প্রকৃতির হয়, তাহোলে?—

গিয়াস বেগ চিন্তায় পোড়্লেন। এদিকে অত্যাচারের মাত্রাও দিন দিন বেড়ে উঠ্তে লাগ্লো। তিনি আর পারলেননা। দেশত্যাগের জন্য তিনি তৈরী হোতে লাগ্লেন।

আমরা যে সময়ের কথা বোল্ছি, মোগল বাদশাহ আকবর তখন হিন্দুস্থানের সিংহাসনে। তাঁর সুশাসন, ন্যায়বিচার এবং গুণগ্রাহিতার কথা গিয়াসবেগ অনেক দিন থেকে শুনে আস্ছিলেন। এখন নিরুপায় হোয়ে তাঁরই কাছে আশ্রয় নেবার জন্য তিনি হিন্দুস্থানের পথে

যাত্রা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বোলে মনে কোরলেন।

ঘর বাড়ী এবং সামান্য যা-কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল. সমস্তই আধা দামে বিক্রী কোরে একটী মাত্র উট, কিছুদিনের খাবার এবং গর্ভবতী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়াসবেগ সুদূর হিন্দুস্থানের পথে যাত্রা কোরলেন।

তখনকার দিনে রাস্তা ঘাট এখনকার মত ছিলনা —অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ছিল। দূর-দূরান্তের পথে যেতে হোলে লোকে কাফেলায় বা দলবদ্ধ হোয়ে যেতো। গিয়াসবেগের মানসিক অবস্থা এমনই শোচনীয় হোয়ে উঠেছিল যে, তিনি কাফেলার প্রতীক্ষা পর্য্যন্ত কোরতে পারলেন না। একাই স্ত্রীকে নিয়ে দেশত্যাগ কোরলেন। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি একবার ভেবেও দেখ্‌লেন না, সেই দূর অজানা দেশে আশ্রয় পাবেন কি না। দেশে যে বিপদ, তার চেয়ে অধিক বিপদও ত সেখানে হোতে পারে, অজানা পথে চোর-ডাকাতের ভয়ও ত আছে। কিছুই

তিনি ভাব্‌লেন না। পরিপূর্ণ আশা ও অদম্য উৎসাহে বুক বেঁধে এক রকম নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি ভারতের পথে বেরিয়ে পোড়্‌লেন।

— —

—দুই—

ইরাণ থেকে ভারতে আস্‌তে গেলে মরুভূমি পেরিয়ে আস্‌তে হয়। মরুভূমি কি জিনিস, তা' যে চোখে না দেখেছে, তার পক্ষে ধারণা করা কঠিন। যোজনের পর যোজন ধোরে কেবল বালির রাশি ধূ ধূ কোরছে। ঘর-বাড়ী গাছপালা ছায়া জল কিছুই সেখানে নাই। কেবল বালি আর বালি। দিনের বেলায় সূর্য্যের কিরণ যত প্রখর হোতে থাকে, এই বালির রাশি ততই গরম হোয়ে উঠ্‌তে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত আগুণের মত গরম হোয়ে ওঠে এবং ফুট্‌তে থাকে। তখন তার

উপর দিয়ে চলে কার সাধ্য। বালিতে পা দেওয়া মাত্রই পায়ে ফোস্কা ওঠে। উট ভিন্ন অন্য কোন জন্তুই তখন তার উপর দিয়ে চোল্‌তে পারে না।

গিয়াসবেগ স্ত্রীর সঙ্গে উটের পিঠে চোড়ে এই মরুভূমির উপর দিয়ে চোল্‌তে লাগ্‌লেন। অসহ্য গরমে এবং তৃষ্ণায় এক একবার তাঁদের প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হোতে লাগ্‌লো। তবু কোন রকমে আশায় বুক বেঁধে তাঁরা সেই মরুপথ অতিক্রম কোরে চোল্‌লেন।

সব-চেয়ে বেশী কষ্ট হোতে লাগ্‌লো তাঁর স্ত্রীর। তিনি পূর্ণ গর্ভবতী ছিলেন। সেই অবস্থায় দুস্তর মরুপথ অতিক্রম কোরতে তাঁর যে দুর্ভোগ হোতে লাগ্‌লো, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

মরুভূমিতে বহু দূরে-দূরে এক একটা গাছ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তাদের বলে পান্থপাদপ। এই সব গাছে ছুরি দিয়ে খোঁচা মার্‌লে পরিষ্কার জল বেরিয়ে আসে, সে জল খুব সুস্বাদ এবং শীতল। মরুভূমির পথিকেরা যখন পিপাসায় অত্যন্ত কাতর

হোয়ে পড়ে, তখন এই সব পাস্থপাদপের জলেই পিপাসা নিবারণ কোরে থাকে। গিয়াসবেগও তাই কোর্তে কোর্তে অতি কষ্টে এগুতে লাগ্লেন।

কয়েকদিন চল্বার পর তাঁর সঙ্গে যে খাবার ছিল তা ফুরিয়ে গেল। গিয়াসবেগ মহা সমস্যায় পোড়্লেন। পান্থপাদপের জলে না হয় তৃষ্ণা নিবারণ কোরলেন, কিন্তু ক্ষুধা নিবারণ কোরবেন কি উপায়ে ? তিনি দারুণ চিন্তায় পোড়লেন।

কিন্তু পথ চলা ছাড়্লেন না। সেই অবস্থাতেই পেটে পাষাণ বেঁধে কোন রকমে এগিয়ে চোল্তে লাগ্লেন। শেষে অবস্থা যখন একেবারেই সঙ্গীন হোয়ে উঠ্ল, দারুণ ক্ষুধায় সমস্ত শরীর অবশ হোয়ে আসবার উপক্রম হোল, তখন নিরুপায় হোয়ে তিনি শেষের সম্বল উট্‌টিকে জবেহ্ কোরে তারই মাংসে উদর পূর্ত্তি কোর্লেন, স্ত্রীকেও খাওয়ালেন। উভয়েই শরীরে বেশ বল পেলেন। তার পর আবার চোল্‌তে আরম্ভ কোর্লেন।

এবার আর উট নাই, স্বামী স্ত্রীতে পায়ে হেঁটে চোলেছেন। সে যে কি কষ্ট, কি দুর্ভোগ—তা যারা ভুগেছে, কেবল তারাই বুঝি বোলতে পারে। মাথার উপরে পোড়া তামার মত অন্তহীন দগ্ধ আকাশ, তার বুকে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত সূর্য্য—আর নীচে আগুণের ফুল্‌কির মত ফুটন্ত বালির রাশি—তারই মাঝে গিয়াসবেগ পায়ে হেঁটে চোলেছেন—গর্ভবতী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে।

এই ভাবে কিছুদূর যাওয়ায় পর হঠাৎ তাঁর স্ত্রীর প্রসব বেদনা উঠ্‌লো। গিয়াসবেগ চোখে অন্ধকার দেখলেন। এই দুস্তর মরুভূমির মাঝে একক অসহায় তিনি, কেমন কোরে কি কোরবেন? নিরুপায় হোয়ে তিনি খোদাকে ডাক্‌তে লাগলেন।

একটু দূরে একটা গাছ দেখ্‌তে পেয়ে গিয়াসবেগের প্রাণে একটু ভরসা এল। তিনি তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে সেই গাছের তলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন।

প্রসবের বেদনা তখন অত্যন্ত প্রবল হোয়ে উঠেছিল। স্ত্রীর কাৎরানীতে গিয়াসবেগের বুকখানা

ফেটে চৌচির হোয়ে যেতে লাগ্‌লো। কি কোরবেন —নিরুপায়।

কিন্তু খোদার রহম ছিল তাঁদের উপর। তাই বেশীক্ষণ কষ্ট পেতে হোলনা। কিছু পরেই গিয়াস-বেগম ফুলের মত সুন্দর একটী মেয়ে প্রসব কোরলেন। শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মরু-প্রান্তর নিমিষের জন্য যেন একবার হেসে উঠলো।

সন্তানের মুখ দেখে আনন্দে গিয়াসবেগ মুহূর্ত্তের জন্য সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর সে আনন্দ নিরাশার আঁধারে মিলিয়ে গেল। সন্তান ত হোল, কিন্তু তাকে বাঁচাবেন কেমন কোরে? সদ্যোজাত শিশুর মুখে দেবার মত কোন খাদ্য সঙ্গে নাই, একমাত্র সম্বল মায়ের দুধ তা-ও নাই। ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, অসহ্য গরমে এবং দুঃসহ ক্লেশে প্রসূতির বুকের দুধ নিঃশেষে শুকিয়ে গিয়েছে। তবে এই সোনার পুতুলীকে কেমন কোরে বাঁচিয়ে রাখবেন। গিয়াসবেগের

চোখের সাম্‌নে সমস্ত দুনিয়া আঁধার হোয়ে এল।

খানিক পরেই প্রসূতির জ্ঞান ফিরে এল। সন্তানের চাঁদ মুখ দেখে তাঁরও সকল দুঃখ-জ্বালা ঘুচে গেল। তিনি শিশুকে কোলে টেনে নিলেন দেখে গিয়াসবেগের বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

কিন্তু এমন কোরে বোসে ভেবে-চিন্তে ত কোন ফল হবে না। তিনি স্ত্রীকে পথ চলার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এ-ও বুঝিয়ে দিলেন, হিন্দুস্থান এখনও দূরে—বহুদূরে। এই দূর পথ তাঁদের অতিক্রম কোর্‌তে হবে, নইলে এই মরুভূমির বুকে শুকিয়ে কুঁকড়ে মোরে থাকা ভিন্ন অন্য গতি নাই।

সন্তানের মুখ দেখে গিয়াস-বেগম একথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। স্বামীর কথা শুনে হঠাৎ যেন তাঁর চৈতন্য ফিরে এল। কিন্তু শক্তি কোথায় তাঁর এই দুস্তর পথ অতিক্রম করবার? তার পর এই শিশু—চাঁদের মত সুন্দর, ফুলের

মত নির্ম্মল—একে কি কোর্‌বেন! নিজেরই চলবার শক্তি নাই, তার উপর এর ভার কেমন কোরে বইবেন? গভীর হতাশার দৃষ্টিতে তিনি শুধু স্বামীর মুখপানে চেয়ে রইলেন। একটী কথাও মুখ থেকে বার কোর্‌তে পার্‌লেন না।

গিয়াসবেগ স্ত্রীর মনের কথা বুঝ্‌লেন। কিন্তু বুঝে কি কোরবেন—যেতেই যে হবে। সাহসে বুক বেঁধে তিনি স্ত্রীর হাত ধোরে তুল্‌লেন। কিন্তু স্ত্রী তখন এত দুর্ব্বল হোয়ে পোড়েছেন যে, সোজা হোয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নাই। তিনি স্বামীর গায়ের উপর ঢোলে পোড়লেন। গিয়াস-বেগ দেখ্‌লেন, এ অবস্থায় একে নিয়ে যেতেই তাঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হোয়ে যাবে, শিশুকে নেবেন কেমন কোরে? তিনি একটু ভাব্‌লেন। শেষে মনকে দৃঢ় কোরে বুকে পাষাণ বেঁধে স্ত্রীকে বোল্‌লেন, একা আমি তোমাদের দুজনকে নিয়ে এ দুস্তর পথে চোল্‌তে পারবো না। যদি তা করি, তাহোলে হিন্দুস্থানের আশা এই মরুভূমির বুকেই

মিলিয়ে যাবে। সকলকেই এক সঙ্গে এই বালির কবরে শুতে হবে। তার চেয়ে মেয়েকে এইখানে রেখে—যেমন দু'জনে এসেছিলাম, তেম্‌নি দু'জনেই চোলে যাই চল। ওকে খোদার হাতে সঁপে দিয়ে যাই। তিনি যদি এর হায়াৎ রেখে থাকেন, যেমন কোরে হোক বেঁচে যাবে, নইলে তুমি আমি হাজার চেষ্টা কোরলেও কোন ফল হবে না।

মায়ের প্রাণে কি একথা সহ্য হয়। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পোড়ে মেয়েকে বুকের ভিতর টেনে নিলেন, কিছুতেই তাকে ছাড়বেন না। কোন্ মা কলেজার টুক্‌রোকে এমন কোরে পথের মাঝে ছেড়ে যেতে পারে?

গিয়াসবেগ দেখলেন, মহাবিপদ উপস্থিত। কিন্তু তাঁর মনের বল অসীম,অসীম সাহস—অদম্য উৎসাহ তাঁর। তিনি হাল ছাড়লেন না। স্ত্রীকে অনেক কোরে বুঝুলেন, অনেক সান্ত্বনার কথা বোল্‌লেন। যখন কিছুতেই কিছু হোলনা, তখন এক রকম জোর কোরে মেয়েকে তাঁর কাছ থেকে

সরিয়ে সেই পান্থপাদপেরই নীচে একটা নিভৃত জায়গায় কাপড় জড়িয়ে রেখে প্রসূতিকে ধোরে নিয়ে পথের উপর উঠলেন।

———

—তিন—

সে সময়ে মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপলক্ষে বণিকের দল, দল বেঁধে যাতায়াত কোর্‌তো। আহার এবং বিশ্রামের জন্য পথ চলা বন্ধ কোরে মাঝে মাঝে তারা সেই বালু-ভূমির উপরেই তাম্বু গাড়তো। তার পর আহার ও বিশ্রাম শেষ কোরে আবার পথ চলা আরম্ভ কোর্‌তো।

গিয়াসবেগ চোলে যাওয়ার বহুক্ষণ পরে একদল বণিক সেইখানে এসে হাজির হোল। রোদ এবং বালির তাপ তখন অসহ্য হোয়ে উঠেছে। ক্ষুধায়

তৃষ্ণায় সকলেরই প্রাণ যায়-যায় হোয়েছে ; কাজেই আর পথ চলা অসম্ভব মনে কোরে তারা সেই পান্থপাদপের চারিদিক ঘিরে—যেখানে গিয়াসবেগ তাঁর মেয়েকে ফেলে গিয়েছিলেন—তাঁবু ফেল্‌তে আরম্ভ কোর্‌লো। এই সময়ে মেয়েটা হঠাৎ কেঁদে উঠলো। মরুভূমির মাঝে শিশুর কান্না! এ বড় আশ্চর্য্য কথা! সকলেরই মনে কেমন একটা কৌতূহল জেগে উঠলো। কেউ কেউ ছুটে গেল—যেদিক থেকে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল সেই দিকে। গিয়ে দেখলো—সদ্য-ফোটা ফুলের মত সুন্দর একটা মেয়ে একলাটী গাছের তলে পোড়ে চীৎকার কোরে কাঁদ্‌ছে। তখনই তারা মেয়েটাকে তুলে তাদের মুরুব্বি মালিক মস্‌উদের কাছে এনে হাজির কোর্‌লো।

মুরুব্বি কিছুই বুঝতে পারলেন না। এটা যেন তাঁর কাছে একটা রহস্যের মত বোধ হোল। মরু-ভূমির মাঝে সদ্যোজাত শিশু—অথচ আশে পাশে কোথাও কেউ নাই। এ কেমন কথা! তিনি

অনেকক্ষণ ধোরে ভাবলেন। কিন্তু কিছুই স্থির কোরতে পারলেন না। শেষে একজনের উপর ভার দিলেন, উপস্থিত দুধ খাইয়ে কোন রকমে শিশুকে শান্ত কোরে রাখতে। তার পর অবস্থা যেমন দাঁড়াবে, তেমনি ব্যবস্থা করা হবে।

আহার ও বিশ্রামে বণিক দলের বহু সময় কেটে গেল। সূর্য্য অস্ত যাবার উপক্রম কোরলো, তখনও পর্য্যন্ত কেউই শিশুর সন্ধানে এল না। অগত্যা মুরুব্বি শিশুকে সঙ্গে নিয়েই আবার যাত্রা শুরু কোরলেন। তিনি স্থির কোরলেন, যে দেশে তাঁরা যাচ্ছেন, সে দেশে যদি উপযুক্ত ধাত্রী কাউকে পান, তাহোলে তাকে শিশুর লালন-পালনের জন্য নিযুক্ত কোরবেন। শিশুটীর সুন্দর মুখ দেখে তাঁর প্রাণে স্নেহের সঞ্চার হোয়েছিল।

সূর্য্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে গরম কমে আস্‌তে লাগলো। আগুণের ফুল্‌কির মত গরম যে বালি, তা-ও ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হোয়ে এল। বণিকদলের পথ চলার অসুবিধা দূর

হোয়ে গেল। তারা বেশ দ্রুত অগ্রসর হোতে লাগলো।

ক্রমে রাত্রি হোয়ে এল। তারার দল একে একে আকাশের নীল চাঁদোয়ার বুকে উঁকি দিয়ে উঠ্‌লো। তাদের মাঝখানে চাঁদ হাস্‌লো। সে হাসি ছড়িয়ে পোড়লো—সারা দুনিয়ার বুকে, মরু-ভূমির বালুরাশির উপর। সমস্ত দিনের অসহ্য গরমের পর জ্যোৎস্নার শীতল মায়ায় বিশ্বসংসার যেন জুড়িয়ে গেল।

অনেক দূর চোলে যাওয়ার পর বণিকদল পরিষ্কার জ্যোৎস্নার আলোকে দেখতে পেল, দু'টো মানুষ বালির উপর নেতিয়ে পোড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখে একজন স্ত্রীলোক মরণাপন্ন হোয়ে পোড়ে আছে আর একজন পুরুষ তার মাথাটা কোলের উপর নিয়ে আধ-শোওয়া আধ-বসা অবস্থায় ধুঁকৃছে।

বণিকেরা আর মুহূর্ত্ত সময়ও দেরী না কোরে তাদের তুলে নিল। তারপর যতদূর তাড়াতাড়ি

সম্ভব সেবা-শুশ্রূষা কোরে তাদের সজীব কোরে তুল্‌লো। তাদের যেন নূতন কোরে দেহে প্রাণ ফিরে এল।

এরা আর কেউ নয়—গিয়াসবেগ ও তাঁর স্ত্রী। মেয়েকে গাছের তলে ফেলে রেখে তাঁরা পথ চোল্‌তে আরম্ভ কোরেছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন রকমে চোলে এই পর্য্যন্ত এসে তাঁরা একেবারেই শক্তিহীন হোয়ে পড়েন। এক পা চলবার শক্তি ছিলনা, তাই বালির উপরেই লুটিয়ে পোড়েছিলেন।

যখন ভাল রকম জ্ঞান ফিরে এল, শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হোল, তখন বণিকদলের মুরুব্বি তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা কোরলেন। গিয়াসবেগ একে একে সমস্ত ঘটনা খুলে বোল্লেন। একটা কথাও গোপন কোরলেন না। শুনে মুরুব্বি যেন আস্‌মান হাত বাড়িয়ে পেলেন। কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েটীর জন্য তাঁর বড়ই দুর্ভাবনা হোয়েছিল। কেমন কোরে তাকে বাঁচাবেন। এখন কপাল ক্রমে

তার মাকেই পেয়ে গেলেন পথের মাঝে। তিনি তখনই মেয়েটাকে এনে তার মার কোলে দিলেন এবং পথের মাঝে কেমন কোরে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন,তা-ও খুলে বোল্লেন। গিয়াসবেগ ও তাঁর স্ত্রীর বুঝতে একটুও বাকী রইল না যে, এ তাঁদেরই সেই কোল্জে-ছেঁড়া ধন। গিয়াসবেগম মেয়েকে বুকে তুলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় তার মুখ ভোরে দিলেন। বলা বাহুল্য এখন থেকে তাঁদের দুঃখ কষ্ট দূরীভূত হোল।

গিয়াসবেগ জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেন যে, সেই বণিকদলও হিন্দুস্থানের যাত্রী। ব্যবসা উপলক্ষে আগেও অনেকবার তাঁরা হিন্দুস্থানে গিয়েছেন এবং সেখানকার অনেক প্রতিপত্তিশালী লোকের সঙ্গে তাঁদের আলাপ-পরিচয়ও আছে। তাঁরা গিয়াসবেগকে আশ্বাস দিলেন, নির্ব্বিঘ্নে তাঁকে হিন্দুস্থানে পৌঁছে দেবেন এবং যাতে তাঁর একটা সুব্যবস্থা হয়, তার জন্যও প্রাণপণে চেষ্টা কোরবেন।

গিয়াসবেগের বুকের উপর থেকে দুর্ভাবনার একটা বিশ-মনী বোঝা যেন হঠাৎ নেমে গেল। তাঁর মনটা অনেকখানি হাল্‌কা হোয়ে উঠলো। স্বচ্ছন্দ মনে স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে তিনি বণিকদলের সঙ্গে হিন্দুস্থানের যাত্রী হোলেন।

—চার—

নানাস্থানে ঘুরে ফিরে দিল্লীতে পৌঁছুতে গিয়াসবেগের বহুদিন সময় লাগলো। দিল্লীতে পৌঁছে তিনি অবাক হোয়ে গেলেন তার শান-শওকৎ জাঁকজমক দেখে। এমনটী ত তিনি কল্পনাও কোর্‌তে পারেননি। সুদূর ইরাণে বোসে লোকের মুখে তিনি দিল্লীর বা মোগল বাদশাহদের সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী শুনেছিলেন, তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। ছুনিয়ার বুকে এমন সুন্দর শহর থাক্‌তে পারে, মানুষের এত ঐশ্বর্য্য হোতে পারে, এতদিন একথা তাঁর কল্পনার সীমার বাইরে ছিল। আজ

চোখে দেখে বিশ্বাস হোল, সত্যই এসব সম্ভব। সত্যই হিন্দুস্থান দুনিয়ার তোষাখানা, সত্যই আকবর শাহ দীন দুনিয়ার বাদশাহ। গিয়াসবেগের মনে হোতে লাগলো, তিনি যেন কোন রূপকথার রাজার রাজ্যে এসেছেন।

চারিদিক দেখে শুনে ও পরিচয় কোরে নিতে কিছুদিন সময় লাগলো। গিয়াসবেগ কাজের লোক ছিলেন, কাজেই তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হোলনা। নইলে তখনকার দিনে দিল্লীতে বড় বড় লোকের সঙ্গে পরিচয় কোরে নেওয়া একজন বিদেশী লোকের পক্ষে মোটেই সহজ ছিলনা।

পরিচয় হোতে হোতে ক্রমে গিয়াসবেগ বাদ্‌শার নজরে পোড়ে গেলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে মালিক মস্‌উদের যথেষ্ট হাত ছিল। আকবর শাহ অতি বিচক্ষণ এবং গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। প্রথম পরিচয়েই তিনি বুঝে নিলেন, গিয়াসবেগের ভিতর যথেষ্ট জ্ঞান বুদ্ধি এবং কর্ম্মশক্তি আছে। তিনি তাঁকে উপেক্ষা কোরলেন না। একটা সামান্য কাজে

নিযুক্ত কোরে তাঁকে বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি বিকাশের সুযোগ দিলেন।

এই খানেই গিয়াসবেগের সৌভাগ্যের সূত্র-পাত হোল।

গিয়াসবেগ দিল্লীতে স্থায়ী হোয়ে বোস্‌লেন। এর পর থেকে তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা হোতে লাগ্‌লো রাজকার্য্যে উন্নতি দেখিয়ে বাদ্‌শার বিশ্বাস ও স্নেহ লাভ করা। তিনি তাতেই তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ কোরলেন।

কিন্তু তাই বোলে পারিবারিক ব্যাপারে যে তিনি অমনোযোগী হোয়ে উঠলেন এমন নয়। বাইরের কাজ শেষ কোরে ঘরে এসে অবসর সময়ে তিনি পারিবারিক উন্নতি ও মর্য্যাদার কথা ভাবতেন। তবে সব-চেয়ে বেশী লক্ষ্য ছিল তাঁর মেয়েটার দিকে। সেই মেয়েই ছিল তখন তাঁর একমাত্র সম্বল। কাজেই যা-কিছু তিনি কোরেছিলেন, সমস্তই তারই মুখ চেয়ে। মেয়ের নাম রেখেছিলেন তিনি মেহেরুন্নেসা। মেহেরুন্নসার রূপে ঘর আলো।

একবার দেখলে আর ভোলা যায় না। কিন্তু শুধু রূপ থাক্‌লে ত চোল্‌বেনা। যতখানি রূপ ততখানি গুণও চাই। তবে ত ওজন ঠিক হবে। সেই জন্য মেয়েকে সকল দিক্‌ দিয়ে সম্পূর্ণ কোরে তোলাই ছিল তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। তাই মেহেরুন্নেসা চার বছরে পোড়তে না পোড়তে তিনি তার লেখা-পড়া শেখার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত কোরলেন।

এই সময়ে গিয়াসবেগের আর একটী পুত্র সন্তান হোল। ছেলের মুখ দেখে তাঁর বুকখানা যেন আরও বেড়ে গেল। মনের কোণে নূতন আশাও উঁকি দিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ এবং কর্ম্ম-শক্তিও যেন বেড়ে গেল।

দিনের পর দিন চোল্‌লো। গিয়াসবেগের বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি দেখে আকবর শাহ্‌ ক্রমে ক্রমে তাঁর প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হোয়ে পোড়লেন এবং উঁচু পদ ও সম্মান দিয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠ ওমাবাদের মধ্যে একজন কোরে দিলেন। গিয়াসবেগের মনের আশা পূর্ণ হোল।

মেহেরুন্নেসা ততদিনে কৈশোরের সীমা প্রায় অতিক্রম কোরে চোলেছে। তার রূপ-গুণের কথা তখন সারা দিল্লীতে ছড়িয়ে পোড়েছে। এমন কি বাদ্‌শার অন্দর মহলে—যেখানে নিত্য নূতন রূপের হাট, সেখানেও মেহেরুন্নেসার রূপের প্রশংসা। অনেকে 'শওক' কোরে কখন কখন দেখতেও আসে। আর যে আসে সে-ই মেহেরুন্নেসাকে দেখে মুগ্ধ হোয়ে যায়। তাকে বাধ্য হোয়ে বোল্‌তে হয়, এমন রূপ জীবনে কখন দেখিনি।

বাস্তবিক মেহেরুন্নেসা রূপে গুণে অতুলনীয় হোয়ে উঠেছিল। তার সে রূপ পরীস্থানের রাণীকেও বুঝি হার মানিয়ে দিত। আর গুণ?—কি লেখা-পড়ায়, কি গানে, কি নাচে, কি ছবি-আঁকায়, কি কবিতা-রচনায়, কি সুচী-শিল্পে—সকল দিক দিয়েই সে সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মোটের উপর দিল্লীতে—শুধু দিল্লীতেই বা কেন, সারা হিন্দুস্থানে তখন তার জোড়া ছিলনা। গিয়াসবেগ মেয়েকে

যেমন ভাবে গোড়্‌তে চেয়েছিলেন, ঠিক তেম্‌নি ভাবেই সে গোড়ে উঠেছিল।

এইখানে একটা কথা বোল্‌তে হোচ্ছে—গিয়াস-বেগ মেহেরকে কোথাও যেতে দিতেন না। বড় বড় আমির ওমরাদের বাড়ীর মেয়েরা অনেক সময় মেহেরকে নিমন্ত্রণ কোরে পাঠাতেন, শুধু তাকে একবার দেখবার জন্য। কিন্তু বাপের নিষেধ থাকায় সে কারও নিমন্ত্রণ রাখতে পারতোনা। এর জন্য অনেকেই মনে মনে মেহেরের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা ভাবতেন, মেহের বুঝি রূপের গরবে তাঁদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কোরলোনা। কিন্তু আসলে তা নয়।

যাহোক অসন্তুষ্ট হোলেও মেহেরকে দেখ্‌তে কারও বাকী রইলনা। রাত দিন কারো প্রশংসা শুন্‌লে মনে আপনা হোতেই একটা কৌতূহল জেগে ওঠে এবং তারই ফলে দিল্লীর প্রায় সব বড় বড় আমীর ওমরাদের বাড়ীর মেয়েরা অন্ততঃ একবারের জন্য এসেও মেহেরকে দেখে গিয়েছেন। দেখে

একবাক্যে স্বীকার কোরেছেন, হ্যাঁ রূপ বটে! এমন না হোলে রূপ!

শাহী মহলের মেয়েদের মনেও যে এ কৌতূহল জাগেনি, তা' নয়। কিন্তু কি কোরবেন, মানের দায়ে তাঁরা এতদূর এগুতে পারেননি। বাদ্‌শার রংমহলের রূপসী হোয়ে একজন সামান্য আমিরের বাড়ীতে তার মেয়েকে দেখ্‌তে যাবেন কেমন কোরে?

কিন্তু বেশীদিন আর তাঁরা কৌতূহল চেপে রাখ্‌তে পারলেন না। যত দিন যেতে লাগ্‌লো, মেহেরের রূপের কথা, প্রতিভার কথা শতমুখে ছড়িয়ে পোড়তে লাগ্‌লো। তাঁরা অতিষ্ঠ হোয়ে একদিন প্রধানা বেগমকে ধোরে পোড়লেন। মেহেরকে একদিন রঙমহলে আনাতেই, হবে। তিনি যদি হুকুম করেন, তাহোলে মেহের ত আস্‌বেই, উপরন্তু কাকেও জবাবদিহীর মধ্যে পোড়্‌তে হবেনা।

প্রধানা বেগম যে মেহেরুন্নেসার রূপ-গুণের কথা শুনেননি, তা' নয়। কিন্তু তিনি বিশাল

হিন্দুস্থানের সম্রাজ্ঞী, সামান্য আমিরের মেয়েকে দেখ্‌বার জন্য কৌতূহলী হওয়া তাঁর পক্ষে শোভা পায় না। কাজেই কোন দিনই তিনি সে প্রসঙ্গ কারো কাছে তোলেন নি। কিন্তু আজ আর তাঁর এড়িয়ে চলবার উপায় রইলনা। সকলে মিলে এমন ভাবে তাঁকে চেপে ধোরলো যে, তিনি 'না' বোল্‌তে পারলেন না।

পরদিনই তিনি মেহেরকে ডেকে পাঠালেন।

স্বয়ং সম্রাজ্ঞী মেহেরকে ডেকেছেন, একথা যখন গিয়াসবেগের কাণে উঠ্‌লো, তখন তাঁর মনটা গৌরবে ও গর্ব্বে ফুলে উঠলো। মেয়েকে মনের মত কোরে সাজিয়ে তিনি বেগম-মহলে পাঠিয়ে দিলেন।

মেহের যখন রংমহলে এসে পৌঁছুল, তখন চারদিকে যেন একটা সাড়া পোড়ে গেল। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই ছুটে এল সেই রূপের প্রতিমাকে দেখতে। শেষে সম্রাজ্ঞী

ও এলেন। মেহেরের মুখের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণের জন্য তিনি আর চোখ ফেরাতে পার্‌লেন না। মনে মনে বোল্লেন হাঁ রূপ বটে! তিনি সস্নেহে মেহেরকে বুকে টেনে নিলেন, তার মুখে চুমো দিলেন। তার পর নিজের পাশে বসিয়ে তার সঙ্গে আলাপ কোর্‌তে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মেহের রংমহলে রইল। নাচ গান রং তামাসা অনেক কিছুই হোল। শেষে সকলে ধোরে পোড়লো, মেহেরকে একটা গান গাইতে হবে। সম্রাজ্ঞীও বোললেন। মেহের গান ধোর্‌লো। সে কি গান! মানুষে গাইছে না ফেরদৌস থেকে কোন হুরী নেমে এসে গাইছে। রংমহলের রূপসীরা—স্বয়ং বেগম পর্য্যন্ত স্থান কাল পাত্র সমস্ত ভুলে গিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত বোসে সেই গান শুন্‌লেন।

যখন গান থাম্‌লো, তখন সম্রাজ্ঞী আবেগ ভরে আবার মেহেরকে বুকে জড়িয়ে ধোরলেন। আবার তার মুখে চুমো দিলেন।

আসর-শেষে সম্রাজ্ঞী মেহেরকে প্রচুর পুরস্কার দিয়ে বিদায় দিলেন এবং অবসর সময়ে আবার আস্‌বার জন্য বিশেষ কোরে বোলে দিলেন।

———

—পাঁচ—

এই দিন থেকে মেহেরের জন্য রংমহলের দরজা সব সময়ের জন্যই খোলা হোয়ে গেল। সে যখন ইচ্ছা তখন যেতে আস্‌তে পারবে, প্রহরিণী বা পুরবাসিনীগণ সব সময়ে তার প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাবে—সম্রাজ্ঞীর এই হুকুম মহলের সকলকেই জানিয়ে দেওয়া হোল।

সারা দিল্লী শহরে এ সংবাদ ছড়িয়ে পোড়তে বড় বেশী সময় লাগলো না। বড় বড় আমীর-ওমরাদের বাড়ীর মেয়েরা যাঁরা বহু সাধ্য-সাধনা—আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও দিনেকের জন্য রংমহলের

দেউড়ী পেরোতে পারেননি, এই সংবাদে তাঁদের মন হিংসায় ভোরে উঠলো। বিশেষ কোরে মেহেরকে ডেকে এনে যেচে এই সম্মান দেওয়ায় তাঁদের বুকে যেন স্ুঁচ বিঁধতে লাগলো। সম্রাজ্ঞীর বিবেক-বুদ্ধির সম্বন্ধে তাঁরা নানা রকম সন্দেহজনক মতামত প্রকাশ কোরতে লাগলেন। কিন্তু এই পর্য্যন্ত! এর বেশী আর কিছু নয়—আর তা সম্ভবও নয়।

মেয়ের এই সম্মানে গিয়াসবেগ মনে মনে বিশেষ গৌরব অনুভব কোরলেন। তাঁর মনের কোণে একটা নূতন আশাও মূহুর্ত্তের জন্য উঁকি দিয়ে চোলে গেল। কিন্তু সে-সব তাঁর মনেই থেকে গেল।

মেহের রংমহলে যায় আসে, কিন্তু নিয়মিত বা খুব ঘন ঘন নয়। তবে যখন যায়, তখন সারা মহলে যেন একটা সমারোহ জেগে উঠে, চারদিক গুল্‌জার হোয়ে যায়। যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ যেন উৎসবের আনন্দে সমস্ত পুরী মুখর হোয়ে ওঠে।

এই ভাবে দিন যায়। ক্রমে ক্রমে একথা শাহজাদা সলিমের কাণে উঠ্‌লো। সলিম আকবর শাহের বড় ছেলে। ভবিষ্যতে তিনিই হিন্দুস্থানের অধিকারী। কাজেই তাঁর মান মর্য্যাদা গৌরব অন্য সমস্ত শাহজাদার চেয়ে বেশী। তাঁর কৌতূহল হোল, তিনি একবার মেহেরুন্নেসাকে দেখবেন।

সলিম আগেও মেহেরুন্নেসার কথা শুনেছিলেন। প্রথম যে দিন সে রংমহলে আসে, সেদিনের কথাও শুনেছিলেন, কিন্তু তখন বড় একটা গ্রাহ্য করেননি। তখন ভেবেছিলেন, সামান্য একজন আমিরের মেয়ে তার কি এমন রূপগুণ থাক্‌তে পারে যে, তাই দেখে লোকে হতবুদ্ধি হোয়ে যাবে—ও কেবল মেয়েদের বাড়াবাড়ি।

কিন্তু এখন তাঁর সে ধারণা বোদ্‌লে গেছে। তিনি দেখ্‌ছেন যে মেহেরুন্নেসাকে নিয়ে একটা বড় রকমের মাতামাতি চোলেছে। সকলেই তার নামে পাগল, তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর মা—স্বয়ং সম্রাজ্ঞী মেয়েদের রূপ-গুণের প্রশংসায় যিনি

একান্তভাবে কৃপণ, তিনি পর্য্যন্ত মেহেরের নাম শুন্‌লে আত্মহারা হন। সুতরাং শাহজাদার ধারণা বোদ্‌লে যাওয়াটা কিছু বিচিত্র নয়।

তিনি স্থির কোরলেন মেহেরকে একবার দেখবেন। কিন্তু কি উপায়ে? মাকে ত এসব কথা বলা চলে না। তবে?

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পর্য্যন্ত তিনি রংমহলের প্রধানা বাঁদীকে হাত কোরলেন। প্রচুর পুরস্কারের লোভে বাঁদী মেহেরকে দেখাতে রাজী হোলো।

কেমন কোরে কি কোরতে হবে বাঁদী সমস্তই শাহজাদাকে শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক কোরে রাখলো। মহলের মাছিটী পর্য্যন্ত এ ষড়যন্ত্রের কথা জান্‌তে পারলো না।

মেহের যেদিন এল, সেদিন আগের মতই আবার সারা রংমহলে উৎসব-সমারোহ জেগে উঠলো। নাচ-গান, রং-তামাসা, হাসি-কৌতুক সবই চোললো।

মেহের যে জায়গাটীতে বোসে ছিল, তার চার ধার ঘিরে বোসে ছিল রংমহলের রূপসীরা। সকলেই স্ফূর্ত্তিতে ভরপুর। কোনদিকে কারও খেয়াল ছিলনা। সেই অবসরে বাঁদী, মেহের যে দিকে মুখ কোরে বোসেছিল, সেইদিকে অনেকটা দূরে একটা নীল পর্দ্দার আড়ালে শাহাজাদা সলিমকে এনে বসালো। পর্দ্দাটা আগে থেকেই টানানো ছিল, কাজেই কারো মনে কোন রকম সন্দেহ হোলনা। রূপসীরা অবাধে স্ফূর্ত্তির তরঙ্গে গা ঢেলে দিয়েছে, সঙ্কোচ কুণ্ঠা তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সোরে গিয়েছে।

সলিম মেহেরকে দেখলেন। প্রাণ ভোরে-চোখ ভোরে দেখলেন। সেই অসংখ্য রূপসীর মধ্যে মেহের বোসে আছে পরীরাণীর মত—পদ্মদীঘির হাজার পদ্মের ভিতর ফুটন্ত রক্ত পদ্মের মত। সলিম চোখ ফেরাতে পারলেন না।

একি রূপ! এমন রূপ ত তিনি জীবনে দেখেন নাই। এ মানুষ না পরী! মানুষের এত রূপ

হয়! সামান্য আমিরের ঘরে তুনিয়ার শ্রেষ্ঠ রত্ন লুকিয়ে আছে আর তিনি হিন্দুস্থানের শাহজাদা—ভবিষ্যতের সম্রাট—তিনি এর কিছুই জানেন না।

এই সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে শাহজাদার অসাবধানতায় কখন, পর্দ্দাটা হঠাৎ একটু বেশী সোরে গেল, অমনি মেহেরের দৃষ্টি সেইখানে গিয়ে পোড়লো। তুজনেই তুজনের চোখে পোড়ে গেল, পরক্ষণে তুজনেই আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিল। শাহজাদা পর্দ্দাটা টেনে আগের মত কোরেদিলেন। মনে মনে একটু লজ্জিতও হোলেন।

এর পরই মেহের যাবার জন্য তৈরী হোল। স্ফূর্ত্তির মাঝখানে হঠাৎ বাধা পেয়ে রূপসীরা সব সজাগ হোয়ে উঠলো। হঠাৎ মেহের চোলে যাবে! কেন! কি হোল! কোনদিনই ত মেহের এমন ব্যস্ত হোয়ে ওঠে না। তবে আজ এমন হোল কেন? তাঁরা মেহেরকে কারণ জিজ্ঞাসা কোরলেন, কিন্তু আশানুরূপ জবাব পেলেন না। আর অল্প

কিছুক্ষণ থাকবার জন্য অনুরোধ কোরলেন, মেহের তা-ও শুন্‌লো না।

হাসি-কৌতুক, আমোদ-আহ্লাদ এক নিমিষে শেষ হোয়ে গেল। সকলেই বিষণ্ণ মনে মেহেরকে বিদায় দিয়ে একটা ভাবনার বোঝা বুকে নিয়ে যে যার কাজে চোলে গেলেন।

———

—ছয়—

কথাটা কিন্তু গোপন রইলনা। সম্রাজ্ঞী যখন শুন্‌লেন, মেহের রংমহলে আসার কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ বিমনা হোয়ে চোলে গেছে, তখন তাঁর মনে বড়ই আঘাত লাগ্‌লো। তিনি মেহেরকে ভাল বেসেছিলেন—নিজের পেটের মেয়ের মতই ভাল বেসেছিলেন। তাই তার এমন হঠাৎ চোলে যাওয়ার সংবাদে তাঁর মনে ব্যথা বেজে উঠ্‌লো। নিশ্চয়ই কোন বিশেষ অসন্তোষের কারণ ঘোটেছে, নইলে বুদ্ধিমতী মেয়ে সে, কখনই অমন কোরে চোলে যেতনা। তিনি গোপনে গোপনে তদন্ত আরম্ভ কোরলেন।

শেষ পর্য্যন্ত কারণ প্রকাশ হোয়ে পোড়লো। তিনি বাঁদীকে ডাকিয়ে অভয় দিয়ে সমস্ত কথা তার কাছ থেকে বের কোরে নিলেন। নিয়ে বুঝ্‌লেন, সে বেচারীর বিশেষ কোন দোষ নেই, স্বয়ং শাহজাদা তাকে আদেশ কোরেছেন, সে আদেশ অমান্য করার শক্তি তার নেই, কাজেই বাধ্য হোয়ে তাকে এ কাজ কোরতে হোয়েছে। সম্রাজ্ঞী বাঁদীকে শাস্তি দিলেন না, কিন্তু তাকে সাবধান কোরে দিলেন, ভবিষ্যতে আর কখনও যেন সে এমন কাজ না করে। শাহজাদা কেন স্বয়ং সম্রাটও যদি তাকে আদেশ করেন, তাহোলেও যেন সে তাঁর আদেশ উপেক্ষা করে। এর জন্য যদি তাকে কোন শাস্তি পেতে হয়, তাহোলে তিনি নিজেই তার জন্য দায়ী হবেন।

শাহজাদা সলিমকেও সম্রাজ্ঞী ডেকে পাঠালেন। এবং এই অন্যায় কাজের জন্য তাঁকে যথেষ্ট তিরস্কার কোরলেন। ভবিষ্যতে আর কখনও যাতে এরকম কাজ না করেন, সেজন্যও সাবধান কোরে দিলেন।

এর পর সম্রাজ্ঞীর চিন্তা হোল মেহেরের জন্য। সে নিশ্চয়ই সলিমকে দেখ্‌তে পেয়েছিল। নইলে, হঠাৎ অমন ভাবে চোলে যাবে কেন? আর দেখ্‌তেই যখন পেয়েছিল, তখন তার মধ্যে যে একটা গোপন অভিসন্ধি ছিল, এটা সহজেই মেহের ধারণা কোরে নিয়েছিল। তাই যদি সে কোরে থাকে, তাহোলে আর ত সে রংমহলে আস্‌বেনা। সম্রাজ্ঞী মহা ভাবনায় পোড়ে গেলেন।

শেষ পর্য্যন্ত আর কোন পথ না দেখতে পেয়ে সম্রাজ্ঞী বিশেষ জরুরী সংবাদ দিয়ে মেহেরকে ডেকে পাঠালেন। একজন বিশ্বাসী বাঁদী তাঁর পাঞ্জা নিয়ে গিয়াসবেগের বাড়ী চোলে গেল।

মেহের বাড়ীতে একথা কারও নিকট বলেনি। কাজেই বাঁদী যখন বেগমের পাঞ্জা নিয়ে তার কাছে গিয়ে হাজির হোল, তখন আর যারা সেখানে ছিল, তারা অবাক হোয়ে গেল। বেগম পাঞ্জা পঠিয়েছেন, মেহেরকে নিয়ে যাবার জন্য!

কিন্তু মেহের বুঝ্‌লো—পাঞ্জা এসেছে কেন। আজকার ডাক বেগমের নিজের ডাক, রংমহলের পক্ষের ডাক নয়। তাই পাঞ্জা এসেছে।

মেহের বাঁদীর সঙ্গে চোলে গেল।

বাড়ীতে কিন্তু এই পাঞ্জা নিয়ে নানা কথা উঠ্‌লো। যার যেমন খুশী, সে তেমনি মতামত প্রকাশ কোর্‌তে লাগলো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্থির সিদ্ধান্ত কিছু হোলনা।

বেগম, মেহেরকে নিজের পাশে বসিয়ে অনেক কোরে বুঝুলেন। বুদ্ধির ভুলে এক কাজ কোরে ফেলেছে, তুমি কিছু মনে কোরো না। আমি তাকে সাবধান কোরে দিয়েছি। ভবিষ্যতে আর কখনও এরকম হবে না—এই রকম অনেক কথা বেগম মেহেরকে বুঝুলেন। কিন্তু মেহের হাঁ নাকিছু বোল্‌লো না কেবল শুনে গেল। তার মুখের ভাব দেখে ঠিক বোঝাও গেল না সে সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট।

যাহোক, বেগম তাকে অনেক কোরে বুঝিয়ে পড়িয়ে আদর-স্নেহ দেখিয়ে বিদায় দিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটাকে তিনি যতটা সহজ ভেবেছিলেন, ঠিক ততটা সহজ নয়। কিছু দিন পরেই তিনি সেটা ভাল রকম বুঝ্‌তে পারলেন এবং বুঝে বিশেষ রকমে বিব্রত হোয়ে পোড়লেন।

মায়ের শাসন সলিমের মন থেকে মেহেরুন্নেসার ছবি মুছে ফেল্‌তে পারে নি। সে ছবি তাঁর বুকে এমন ভাবে আঁকা হোয়ে গিয়েছিল যে, মোছ্‌বার উপায় ছিল না। প্রথম দেখার পর থেকেই সলিম মেহেরকে পাবার জন্য একেবারে পাগল হোয়ে উঠেছিলেন। কিছুতেই তিনি মনকে দমন কোর্‌তে পার্‌ছিলেন না। তাঁর কাছে দুনিয়া একদিকে আর মেহের অন্যদিকে। তিনি একেবারে মরিয়া হোয়ে উঠেছিলেন।

এদিকে মেহের রংমহলে আগে যেমন আস্‌ছিল, পরেও তেমনি আস্‌তে লাগলো। মাঝে যে ঘটনাটা ঘোটে গিয়েছিল, সম্রাজ্ঞীর সাবধানতায় সেটা বড় একটা ছড়িয়ে পোড়্‌তে পারেনি। কাজেই মেহেরের রংমহলে যাতায়াতের কোন বিঘ্নও ঘটেনি।

এখন আর সলিম মেহেরকে দেখ্‌বার জন্য বাঁদীদের সাহায্য নেন না। কারণ তিনি জান্‌তে পেরেছিলেন, মায়ের কড়া শাসনের ফলে কেউই আর তাঁকে সে কাজে সাহায্য কোরবে না। তাই নিজেই তিনি গোপনে গোপনে সকল ব্যবস্থা কোরে নিয়েছিলেন। তিনি গুপ্তচর রেখেছিলেন, মেহের কোন্ দিন কোন্ সময়ে রংমহলে আস্‌বে সেই খবর দেবার জন্য। তাদেরই মারফৎ তিনি সকল সংবাদ পেতেন। এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে অলক্ষ্যে থেকে মেহেরকে দেখে মনের সাধ মিটাতেন।

কিন্তু এতে ফল ফল্‌লো বিপরীত। ক্রমাগত কিছুদিন যদি শাহ্‌জাদা মেহেরকে না দেখ্‌তে পেতেন, তা হোলে হয়ত তাকে ভুল্‌তে পার্‌তেন, কিন্তু বারংবার দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা দিনে দিনে প্রবল হোয়ে উঠ্‌তে লাগলো। তিনি একেবারে অধীর হোয়ে উঠ্‌লেন। একদিন সুযোগ বুঝে মেহেরের সঙ্গে আলাপও কোরে ফেল্‌লেন।

শাহজাদা যে গোপনে গোপনে তাকে লক্ষ্য করেন, বুদ্ধিমতী মেহেরের একথা জান্‌তে বাকী ছিল না। তাই হঠাৎ যে দিন নিরালা পেয়ে তিনি তার সঙ্গে আলাপ কোর্‌তে এলেন, সেদিন সে আদৌ আশ্চর্য্য হোল না। বেশ সহজ এবং অকুণ্ঠ ভাবেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বোল্‌লো।

সে-ও মনে মনে শাহজাদাকে ভাল বেসেছিল। কিন্তু কথাবার্ত্তার সময় শাহজাদাকে সেটা কিছুতেই বুঝ্‌তে দিল না। শাহজাদা কিন্তু প্রাণ খুলে তাকে নিজের ভিতরের সব কথাই বোলে ফেল্লেন।

এই ঘটনার পর থেকে সলিম একেবারেই বে-পরোয়া হোয়ে উঠ্‌লেন। যেমন কোরেই হোক তিনি মেহেরকে বিয়ে কোরবেন, এই হোল তাঁর প্রতিজ্ঞা।

কথাটা ক্রমে ক্রমে বাদ্‌শার কাণে গেল। অনু-সন্ধান কোরে জান্‌লেন, কথাটা সত্য। সলিমের মতিগতিও তিনি ভাল কোরে লক্ষ্য কোরলেন। তাতে বুঝলেন শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা না কোরলে

অনর্থ ঘোটবে। তিনি স্থির কোরলেন, মেহেরকে কোন সৎপাত্রে দান কোরে তাকে দূরদেশে পাঠিয়ে দেবেন, একেবারে শাহ্জাদার দৃষ্টি বা নাগালের বাইরে।

তিনি গিয়াসবেগকে ডাকিয়ে সব কথা খুলে বোল্লেন। গিয়াসবেগের আশা হয়ত অন্য রকম ছিল, কিন্তু বাদ্শাহ যখন বোল্ছেন, তখন ত আর না বলবার উপায় নাই। কাজেই সম্মতি দিলেন।

মেহেরুন্নেসার মত মেয়ের পাত্র মিলতে দেরী হয় না, হোলও না। অল্পদিনের ভিতরেই আলীকুলি নামে একজন বীর যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে হোয়ে গেল। বাদ্শাহ নিজেই উদ্যোগী হোয়ে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

সলিমের মাথায় আকাশ ভেঙে পোড়্লো। বিশ্ব-সংসার তাঁর চোখে আঁধার হোয়ে গেল। কিন্তু কি কোরবেন, উপায় নাই।

বিয়ের পরে বাদ্শাহ পূর্ব্বের মতলব অনুযায়ী কাজ কোরলেন। নূরজাহানকে সঙ্গে দিয়ে আলী-

কুলিকে শের আফগান খাঁ খেতাব দিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন সুদূর বংলা দেশে—বর্দ্ধমানে—একেবারে শাহজাদার দৃষ্টি ও নাগালের বাইরে।

এই ব্যবস্থায় সলিমের মনের অবস্থা আরও খারাপ হোয়ে উঠ্‌লো। বিয়ের পর যতদিন মেহের দিল্লীতে ছিল, ততদিন তবু একটা সান্ত্বনা ছিল যে সে নিকটেই আছে, কিন্তু এখন সে সান্ত্বনাও শেষ। শাহজাদা ঘর নিলেন। তাঁর বুকখানা বুঝি ভেঙে চূরমার হোয়ে গেল।

ছেলের অবস্থা দেখে বাদ্‌শারও মনটা খারাপ হোয়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি তার বিয়ের বন্দোবস্ত করবার জন্য সকলকে পাত্রীর সন্ধান কোরতে বোল্‌লেন।

সে সময়ে অম্বরের রাজা মানসিংহ ছিলেন বাদ্‌শার সেনাপতি। তাঁর ভগ্নী যোধাবাই তখনও অবিবাহিতা ছিলেন। যোধাবাই পরমা সুন্দরী এবং সেই রকম গুণবতী। বাদ্‌শাহ ভাল কোরে অনুসন্ধান কোরে সেই সম্বন্ধই পাকা কোরে ফেল্‌লেন এবং

যথাসময়ে বিপুল সমারোহে অম্বর-রাজকুমারীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে ফেল্‌লেন। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সলিমকে এই বিয়ে কোরতে হোল। কারণ, বাপের হুকুম অমান্য করবার উপায় তখন তাঁর ছিল না।

এই ভাবে আকবর শাহ সলিম ও মেহেরুন্নেসার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হুজনকে হুজনার কাছ থেকে বহুদূরে সরিয়ে দিলেন।

—সাত—

শের আফগান বাঙলায় এলেন বর্দ্ধমানের শাসনভার নিয়ে, এবং সেই খানেই মেহেরুন্নেসাকে নিয়ে স্থায়ী ভাবে সংসার পাতলেন। তাঁর মধ্যে অভাব কিছুরই ছিল না। তিনি বীর—সুশ্রী, সবল, সুগঠিত দেহ। তার উপর স্নেহ ভালবাসাও ছিল তাঁর অফুরন্ত। সে সমস্তই তিনি নিঃশেষে মেহেরুন্নেসাকে ঢেলে দিলেন। প্রথম প্রথম মেহরুন্নেসার মনটা কেমন যেন বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল, কিন্তু যখন স্বামীর হৃদয়ের পরিচয় পেল, তখন তার মন একেবারেই শুধ্‌রে গেল।

বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই তাঁদের দিন কেটে চোল্‌লো। দুঃখ নাই, শোক নাই, ব্যথা নাই, বেদনা নাই,—কেবল আনন্দ আর আনন্দ। দুটীতে মনের সুখে সংসার-সাগরে তরী বেয়ে চোল্‌লেন। কিছুদিন পরে তাঁদের এই আনন্দের সাগরে যেন নূতন কোরে জোয়ার জেগে উঠ্‌লো। মেহেরের একটী মেয়ে হোল। সে-ও মায়ের মতই সুন্দরী, মায়ের মতই সুগঠনা। মেয়ের মুখ দেখে শের আফগান ও মেহের দুনিয়া ভুলে গেলেন। তাঁদের সুখ শান্তির আর অবধি রইল না।

কিন্তু দিন কারো চিরদিন সুখে কাটেনা। এঁদেরও কাট্‌লোনা। কিছুদিন পরেই সংবাদ এল আকবর শাহ মারা গিয়েছেন। শাহ্‌জাদা সলিম জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বোসেছেন। খবরটা শুনেই হঠাৎ কি একটা অজানা ভয়ে মেহেরের বুকটা যেন একবার কেঁপে উঠ্‌লো। কিন্তু সে কথা সে কাউকে জান্‌তে দিলনা। স্বামীকেও না।

সলিম জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বোসেছেন। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত ভারত তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। আজ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলে কে? কে তাঁর ক্ষমতার গতি রোধ করে?

এতকালের অ-দেখার ফলেও জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নেসাকে ভুল্‌তে পারেন নি। সিংহাসনে বোসেই তাঁর মন লাগাম-ছাড়া ঘোড়ার মত ছুট্‌লো বাংলার দিকে। মেহেরকে তাঁর চাই-ই চাই। তা' সে যেমন কোরেই হোক। তিনি শের আফগানকে খুন কোরে মেহেরকে দিল্লীতে আন্‌বার ব্যবস্থা ঠিক কোরলেন এবং সেই রকম পরামর্শ দিয়ে লোকও পাঠালেন বর্দ্ধমানে।

কিন্তু কাজটা অত সহজ ছিল না। আগেই বোলেছি, শের আফগান বীর পুরুষ ছিলেন। খালি হাতে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ কোরে বাঘকে হত্যা কোরে তিনি শের আফগান উপাধি লাভ কোরেছিলেন। তাঁকে খুন করা ত সহজ নয়। কাজেই জাহাঙ্গীরের

নিযুক্ত ঘাতকেরা কিছুই কোর্‌তে পারলো না। উপরন্ত আক্রমণ কোর্‌তে গিয়ে নিজেরাই দু'চার জন ঘায়েল হোয়ে পোড়লো।

বাদ্‌শাহ আবার লোক পাঠালেন। এবারও তারা শের আফগানের তলোয়ারের ঘা খেয়ে ফিরে গেল। খবর পেয়ে বাদ্‌শাহ আগুনের মত জ্বোলে উঠ্‌লেন। বিশ্বাসী কর্ম্মচারী কুতুবুদ্দিনকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত কোরে তাঁকে হুকুম দিলেন, যেমন কোরে পার, শের আফগানের মুণ্ড দিল্লীতে পাঠাবে। তার মুণ্ড আমার চাই-ই চাই।

কুতুবুদ্দিন লোকজন নিয়ে বর্দ্ধমানের পথে রওয়ানা হোয়ে পোড়লেন।

শের আফগান এবং মেহের দু'জনেই এ ষড়-যন্ত্রের কথা বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। সেজন্য সাবধানও হোয়েছিলেন যথেষ্ট। বিশেষ প্রয়োজন না হোলে মেহেরুন্নেসা শের আফগানকে বাইরে যেতে দিত না। তা-ও সশস্ত্র এবং সুরক্ষিত অবস্থায়। কে জানে শত্রু কখন কি ভাবে আক্রমণ করে।

কুতুবুদ্দিন বাংলায় এসে শের আফগানকে কয়েকবার ডেকে পাঠালেন, কিন্তু শের আফগান কিছুতেই তাঁর সঙ্গে দেখা কোরলেন না। কুতু-বুদ্দিন বুঝেছিলেন, সাম্‌না-সামনি আক্রমণ কোরে শের আফগানকে হত্যা করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি গুপ্ত ভাবে কাজ শেষ করবার ব্যবস্থা কোরলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর শের আফগান যখন নিরস্ত্র অবস্থায় বাড়ীর বাইরের দিকের আঙিনায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় কুতুবুদ্দিন অনুচরদের নিয়ে একযোগে তাঁকে আক্রমণ কোরলেন। শের আফগান একা, তার উপর নিরস্ত্র আর শত্রুরা সংখ্যায় অনেক এবং সকলেই সশস্ত্র। সে অবস্থায় কি কোরবেন তিনি। নিরস্ত্র নিরুপায় অবস্থায় তাঁকে শত্রুর হাতে প্রাণ দিতে হোল।

আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে একটা গোলমালের শব্দ হোতেই মেহের ভিতর থেকে ছুটে উপরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কি কোরবে

সে, উপায় নাই। নিরুপায় হোয়ে পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে সেই হত্যাকাণ্ড দেখ্‌লো। মনে মনে এই আশঙ্কাই সে পোষণ কোরেছিল, আজ সত্য সত্যই তা ফোলে গেল।

———

—আট—

মেহেরকে তার মেয়ের সঙ্গে দিল্লীর হেরেমে আনা হোল। কিন্তু ফল হোল বিপরীত। বাদ্‌শাহ ভেবেছিলেন, মেহের আজও সেই মেহেরই আছে। বিয়ের কথা তোল্‌বামাত্রই সে আনন্দের সঙ্গে রাজী হবে। কিন্তু কাজের বেলা হোল, ঠিক উল্‌টা। বিয়ের কথা ত সে কাণে তুল্‌লোই না, উপরন্তু বাদ্‌শাহ যে সব উপহার-উপঢৌকন এবং বিলাস-ব্যসনের মূল্যবান জিনিস পত্র পাঠিয়েছিলেন, সমস্তই তাচ্ছিল্য ভরে ফিরিয়ে দিল। নিতান্ত সাদাসিদে পোষাকে, সামান্য অবস্থায়, সামান্য আহারে মেয়ে-

টাকে নিয়ে সে দিন কাটাতে লাগ্‌লো। দেখে শুনে বাদ্‌শাহ আশ্চর্য্য হোয়ে গেলেন। তিনি মেহেরের বাপ ও ভাই দু'জনকেই মেহেরের কাছে পাঠালেন। কিন্তু মেহের কারও সঙ্গে দেখা কোরলো না। দু'জনকেই ফিরিয়ে দিল। বাদ্‌শাহ মনকে বুঝুলেন—হাজার হোলেও স্বামী-শোক ত বটে! প্রথম অবস্থায় আঘাতটা খুব বেশী রকমই হোয়েছে, কাজেই মনটা খারাপ আছে। এখন ঘা দেওয়াটা ভাল হয়নি। থাক্—কিছুদিন পরেই না হয় কথা তোলা যাবে।

কিন্তু কিছুদিনের জায়গায় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল। মেহেরুন্নেসার কোন পরিবর্ত্তনই দেখা গেল না। বাদ্‌শাহ অতিষ্ঠ হোয়ে উঠ্‌লেন। যতবার তিনি পয়গাম পাঠালেন, তত বারই মেহের ফিরিয়ে দিল। শেষে নিরুপায় হোয়ে তিনি কঠোর নীতি ধোরলেন। মেহেরুন্নেসার বাপ ও ভাই - গিয়াসবেগ ও আসফ খাঁকে ডেকে বোলে দিলেন, তোমরা যদি তোমাদের মেয়ে ও

বোনকে রাজী কোরতে না পার, তাহোলে তোমাদের আমিরী-ওমরাগিরি ত থাক্‌বেইনা, উপরন্তু তোমাদের যা' কিছু আছে, সমস্তই শাহী-সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে।

গিয়াসবেগ ও আসফ খাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পোড়লো। মেহেরের যে রকম জেদ তাঁরা দেখেছেন, তাতে সে যে বাদশাহকে বিয়ে কোর্‌তে রাজী হবে, এমন আশা কিছুতেই করা যায় না। কাজেই তাঁদের ভাবনার সীমা রইল না।

তবু একবার শেষ চেষ্টা কোরে দেখা দরকার! এই ভেবে অনেক 'চেষ্টা-চরিত্র' কোরে গিয়াসবেগ মেয়ের সঙ্গে দেখা কোরলেন, তাকে নিজেদের অবস্থার কথা সমস্তই বুঝিয়ে বোল্‌লেন। কিন্তু মেহের অচল অটল, কিছুতেই রাজী হোলনা। গিয়াসবেগ হতাশ হোয়ে ফিরে গেলেন।

ছেলে আসফ খাঁ, বাপের কাছে সব কথাই শুন্‌লেন। শুনে বোনের উপর তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে

চোটে গেলেন। কিন্তু চোটে ত কোন ফল হবেনা। তাই একবার দেখা কোর্‌তে গেলেন।

বারংবার এই বিয়ের ব্যাপারে অনুরোধ-উপরোধের জন্য মেহেরুন্নেসা অত্যন্ত বিরক্ত হোয়ে উঠেছিল। তাই আসফ খাঁ সাম্‌নে হাজির হোতেই বোলে উঠ্‌লো, তুমিও কি আমাকে বিয়ের জন্য অনুরোধ কোর্‌তে এসেছ?

বোনের ভাব দেখে আসফ খাঁ খুব নরম সুরে বোল্‌লেন, কি করব উপায় নেই, তুমি মুখ তুলে না চাইলে আমাদের সর্ব্বস্ব যায়, পথে বোস্‌তে হয়।

মেহের উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা কোরলো, আমি যদি বাদ্‌শাহকে বিয়ে করি, তাহোলে সর্ব্বস্ব রক্ষা হবে—পথে বসা বন্ধ হবে?

আসফ খাঁ তেম্‌নি ভাবেই জবাব দিলেন, হবে।

মেহের খানিকক্ষণ কি ভাব্‌লো, তার পর বোল্‌লো, যাও—বাদ্‌শাহকে বলোগে আমি তাঁকে বিয়ে কোরবো।

আসফ খাঁ যেন আসমান হাত বাড়িয়ে পেলেন। তিনি আর কাল বিলম্ব না কোরে বাদ্শার কাণে খবর পৌঁছুতে ছুট্লেন।

বাদ্শাহ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মেহেরুন্নেসার বিয়ে হোল—খুব ধুমধামে—সমারোহে—শান-শওকতে। বাদ্শার বহুকালের আশা এতদিনে পূর্ণ হোল।

মেহেরুন্নেসার নাম হোল এখন নূরজাহান বা দুনিয়ার আলো।

সম্রাজ্ঞী হোয়ে নূরজাহান ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার কোর্তে লাগলেন। তাঁর রূপ ছিল যেমন অসাধারণ, জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রতিভাও ছিল তেমনি অসামান্য। কাজেই অল্পদিনের ভিতরেই সারা হিন্দুস্থানে তাঁর জয়জয়কার পোড়ে গেল। ক্রমে বাদ্শাহ তাঁর হাতের পুতুল হোয়ে পোড়্লেন। তিনি নামে মাত্র বাদ্শাহ রইলেন, কিন্তু আসলে সাম্রাজ্য শাসন কোর্তে লাগলেন নূরজাহান। এমনকি টাকার উপরেও বাদ্শার নামের পাশে নূরজাহানের নাম খোদাই করা হোল।

নূরজাহান

এক কথায় কিছুদিনের ভিতরেই এত বড় হিন্দুস্থান নূরজাহানের হাতের মুঠোর মধ্যে চোলে গেল।

কিন্তু এটা রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকদের চোখে যেন কেমন-কেমন ঠেক্‌তে লাগলো। মেয়ে মানুষের এতখানি ক্ষমতা ও প্রভুত্ব তাঁরা সহ্য কোরতে পার্‌লেন না। তাই গোপনে গোপনে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র আরম্ভ কোরলেন। কিন্তু নূরজাহানের চোখে ধূলো দেওয়া অত সহজ ছিলনা। অল্পদিনের ভিতরেই তিনি সমস্তই ধোরে ফেল্‌লেন, এবং কঠোর হস্তে ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ কোরে ফেল্‌লেন। লোকে বুঝলো যে, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান দুর্ব্বল হাতে হিন্দুস্থানের শাসন-ভার গ্রহণ করেননি। আর তারা উচ্চবাচ্য কোর্‌তে ভরসা পেলনা।

এর পর কয়েক বছর বেশ নির্ব্বিঘ্নে ও শান্তিতে কেটে গেল। এই সুযোগে নূরজাহান, ভবিষ্যতে —বাদ্‌শাহ জাহাঙ্গীরের অবর্ত্তমানে সিংহাসনের

উপর যাতে তাঁর আধিপত্য অটুট থাকে, তার জন্য গোপনে গোপনে চেষ্টা কোর্‌তে লাগ্‌লেন। শের আফগানের ঔরসে তাঁর যে মেয়ে হোয়েছিল, সেই মেয়ের সঙ্গে তিনি বাদ্‌শার অন্য এক বেগমের গর্ভ-জাত ছেলে শাহরিয়ারের বিয়ে দিয়ে দিলেন—অবশ্য সম্রাটের মত নিয়ে—এবং তাকেই ভবিষ্যতে সিংহাসনে বসাবার জন্য আগে থেকেই তোড়জোড় আরম্ভ কোরে দিলেন।

বাদ্‌শার অন্য ছেলে খুর্‌রম একথা জান্‌তে পেরে সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে বাপের কাছে নালিশ জানালেন। কিন্তু ফল কিছুই হোলনা। নূরজাহানের বিরুদ্ধে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কিছুই করবার ক্ষমতা ছিলনা। শাহজাদা খুর্‌রম যখন দেখলেন, বাপ এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন,—সম্রাজ্ঞীর কাজের উপর কথা কইবার শক্তি তাঁর নেই, তখন তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা কোর্‌লেন। সম্রাজ্ঞী এর জন্য রীতিমত প্রস্তুত হোয়েই ছিলেন, কাজেই এ বিদ্রোহ দমন কোর্‌তে তাঁর বেশী সময় লাগ্‌লো না।

কিন্তু খুর্‌রমের মনের আগুণ নিভ্‌লোনা। প্রথম বিদ্রোহে কিছু কোরতে না পেরে কিছুদিন পরে তিনি আবার দ্বিতীয় বার বিদ্রোহ উপস্থিত কোরলেন। তার পর তৃতীয় বার। এই ভাবে বারংবার বিদ্রোহ কোরে তিনি সম্রাজ্ঞীকে বিব্রত কোরে তুল্‌লেন। কিন্তু এতেও সম্রাজ্ঞীর আশা ভঙ্গ হয়নি। এই সব গুরুতর কাজের ব্যস্ততার ভিতর থেকেও তিনি শাহরিয়ারের সিংহাসন লাভের পথ পরিষ্কার করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কোর্‌ছিলেন।

কিছুদিন পরে সেনাপতি মহাবৎ খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা কোরলেন। শুধু বিদ্রোহ নয়, তিনি স্বয়ং সম্রাটকে বন্দী কোরে ফেল্‌লেন। এতদিনে সম্রাজ্ঞীর বুক দোমে গেল। মহাবৎ খাঁ বীর—অসমসাহসী বীর। তার উপর বুদ্ধি এবং কৌশলও তাঁর অসাধারণ। সম্রাজ্ঞী ভাবনায় পো ড়লেন। কিন্তু তিনি হাল ছেড়ে দেবার লোক ছিলেন না। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে সম্রাটের মুক্তির জন্য এক

কৌশল জাল বিস্তার কোরলেন। মহাবৎ খাঁ তাঁর চাতুরী বুঝে উঠ্‌তে পারলেন না। জালে পোড়ে গেলেন। তখন অক্লেশে সম্রাটের উদ্ধার হোয়ে গেল। আবার সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের জয়জয়কার পোড়ে গেল। মহাবৎ খাঁ এতদিনে বুঝ্‌লেন কূট-কৌশলে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কাছে তিনি শিশুমাত্র।

কিন্তু এত কোরেও শেষ রক্ষা হোল না। বাদ্‌শাহ জাহাঙ্গীরের শরীর ভেঙে এসেছিল। কয়েক বছর পরেই হিন্দুস্থানের বাদ্‌শাহী ছেড়ে তাঁকে পরলোকের যাত্রী হোতে হোল। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শাহজাদা খুর্‌রম শাহজাহান অর্থাৎ তুনিয়ার বাদ্‌শাহ এই নাম নিয়ে হিন্দুস্থানের সিংহাসন দখল কোরে বোস্‌লেন। সম্রাজ্ঞীরও শরীর ভেঙে এসেছিল। পূর্ব্বের সে উৎসাহ উদ্যমও ছিল না ; কাজেই খুর্‌রমের সিংহাসন লাভে কোন বিঘ্ন উপস্থিত কোর্‌লেন না। আর কোরলেও কোন ফল হোত না। কারণ সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি তখন খুর্‌রমের পিছনে।

কিন্তু এত মনোমালিন্য এবং শত্রুতা সত্ত্বেও শাহজাহান সিংহাসনে বোসে নূরজাহানের প্রতি এতটুকু অসদ্ব্যবহার কোরলেন না। তিনি প্রচুর বৃত্তি দিয়ে সম্রাজ্ঞীকে লাহোরে পাঠিয়ে দিলেন।

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নূরজাহান লাহোরেই ছিলেন। এইখানেই তাঁর ইহজীবনের অবসান ঘটে। দুনিয়ার জ্যোতিঃ এইখানেই শেষ প্রতিভা ছড়িয়ে চিরকালের জন্য আঁধারে মিলিয়ে যায়।

লাহোরে আজও নূরজাহানের কবর দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কবরের উপরে সম্রাজ্ঞীর নিজের রচিত একটা ফার্সী কবিতা খোদাই করা আছে, কবিতাটী এই—

—"বার মজারে মা গরীবাঁ
ন্য চেরাগে ন্য গুলে
না পরে পরওয়ানা সুজাদ
ন্য স্দায়ে বুল্‌বুলে।"

বাঙ্গালী কবি এর তরজমা কোরেছেন—

গরীব-গোরে দীপ জ্বেলোনা,
ফুল দিওনা কেউ ভুলে,
শ্যামা পোকার না পোড়ে পাক,
দাগা না পায় বুল্‌বুলে।

*   *   *   *

আজ তুনিয়ার বুকে নূরজাহানের অস্তিত্ব নাই। আছে তাঁর নাম—কীর্ত্তি। সে নাম, সে কীর্ত্তি অনন্ত কালের সাক্ষী হোয়ে থাক্‌বে। তিনি সুন্দরী ছিলেন—অসামান্যা সুন্দরী, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৌন্দর্য্য-বোধও ছিল অসাধারণ। সাহিত্যে শিল্পে ললিত কলায় তাঁর যে সূক্ষ্ম জ্ঞান ছিল, তা' দেখে লোকে অবাক হোয়ে যেত। তিনি অনেক কিছু নূতন সৃষ্টি এবং নূতন আবিষ্কার কোরেছিলেন। তার মধ্যে আতর-ই নূরজাহাঁ, পেশোয়াজে তুদামী, পাঁচ-তোলিয়া, ফরাস্-ই-চন্দনী প্রভৃতি আজও লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে। এ ছাড়া তিনি বহু বিচিত্র প্রকারের অলঙ্কার এবং পরিচ্ছদাদির

প্রচলন কোরে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কোরেছিলেন। নারীর স্বভাবজাত দয়া-দাক্ষিণ্য ও কোমলতা প্রভৃতিও তাঁর মধ্যে অফুরন্ত ভাবে ছিল। তিনি বহু অনাথ-আতুরকে মাসিক বৃত্তি দিয়ে সাহায্য কোর্‌তেন। নিজ ব্যয়ে সহায়-হীনা অনাথা বালিকাদের বিবাহ দিতেন। অর্থা-ভাবে যারা হজ্জ যাত্রার পুণ্য সঞ্চয় কোরতে অপারগ হোত, মুক্ত হস্তে দান কোরে তাদের পুণ্যের পথ পরিষ্কার কোরে দিতেন। তাই যেদিন সুদূর লাহোর থেকে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ ছড়িয়ে পোড়েছিল, সেদিন হিমাচল থেকে কন্যা-কুমারী পর্য্যন্ত সমগ্র হিন্দুস্থান মাতৃহারার ন্যায় আর্ত্তকণ্ঠে হাহাকার কোরে কেঁদে উঠেছিল।

মমতাজমহল

মমতাজমহল

আগ্রার তাজমহল আজ সারা দুনিয়ার বিস্ময়ের জিনিস হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেশ-দেশান্তর থেকে লোক আসে এর অপরূপ রূপ দেখ্‌তে, এর মহিমার কাছে মাথা নীচু কোর্‌তে। দেখে সবাই আশ্চর্য্য হয়—মুগ্ধ হয়। ভাবে, মাটীর বুকে কেমন কোরে এ রূপের তাজ গোড়ে উঠ্‌লো। কোন্‌ অমর শিল্পী এমন কোরে একে রূপ দিল!

তাজ তাজ-ই। তার অন্য তুলনা নাই। কারু-শিল্পের চরম আদর্শ—প্রেমের পুণ্য তীর্থ,—বিরহের অমর কাব্য। হিন্দুস্থানের প্রেমিক বাদশাহ

শাহজাহান বুকের রক্ত দিয়ে একে সৃষ্টি কোরে গিয়েছেন - বেগম মমতাজের বিরহে। তাঁরই সমাধি—তাঁরই স্মৃতির মর্ম্মর মন্দির এই তাজ।

'দুনিয়ার জ্যোতিঃ' নূরজাহান যে বংশে জন্মেছিলেন, মমতাজেরও জন্ম হোয়েছিল সেই বংশে। নূরজাহানের ভাই আসফ খাঁর মেয়ে ছিলেন তিনি। ছেলেবেলাকার নাম ছিল তাঁর আর্জ্জেমন্দবানু। বাপের সংসারে রূপে গুণে এবং শিক্ষায় নূরজাহানেরই মত তিনি গোড়ে উঠেছিলেন অপরূপ ভাবে। তবে নূরজাহানের সঙ্গে তাঁর তফাৎ ছিল এক জায়গায়। নূরজাহানের ভিতর যে তেজ, যে পৌরুষ, যে সাহস ছিল, আর্জ্জেমন্দবানুর ভিতর তা' ছিলনা। তাই নূরজাহান সম্রাজ্ঞী হোয়ে সাম্রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিতে পেরেছিলেন এবং পুরুষের মত শক্তি ও সাহসের সঙ্গে তা বহনও কোরেছিলেন। কিন্তু আর্জ্জেমন্দ বানু তা' পারেননি। তিনি যে নারী সেই নারীই ছিলেন। পৌরুষকে, তেজকে কোন দিনই তিনি বরণ কোর্‌তে

মমতাজমহল

পারেননি। বিশাল হিন্দুস্থানের সম্রাজ্ঞী হোয়েও স্বামীর সেবা, পুত্রকন্যার লালন পালন এবং সংসারের কাজকর্ম্ম নিয়ে তিনি জীবন কাটিয়ে গিয়েছিলেন। নূরজাহানের জীবন সার্থক হোয়েছিল সম্রাজ্ঞী রূপে, আর আর্জ্জেমন্দবান্নুর জীবন সার্থক হোয়েছিল গৃহিনী জননী ও পত্নীরূপে। এই খানেই দু'জনের প্রভেদ—আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

মেহেরুন্নেসা যখন 'নূরজাহান" নাম নিয়ে দিল্লীর সম্রাজ্ঞী হোয়ে বসেন, আর্জ্জেমন্দ বান্নু তখন দশ কি এগারো বছরের কিশোরী। সেই সময় থেকেই তিনি বেগম মহলে যাতায়াত কোর্‌তে থাকেন। সম্রাজ্ঞীর ভাইঝি, কাজেই সকলেই তাঁকে আদর কোর্‌তো, ভালবাস্‌তো। মহলের সব জায়গাতেই তাঁর জন্য দরজা খোলা ছিল। তিনি অবাধে যেখানে ইচ্ছা যেতেন আস্‌তেন। এই ভাবে শাহী মহলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হোয়ে ওঠে।

নূরজাহান আর্জ্জেমন্দ বান্নুকে মনে প্রাণে স্নেহ কোরতেন বটে, কিন্তু তাঁর সামনে সে রকম কোন

ভাব প্রকাশ কোর্‌তেন না। এটা ছিল তাঁর চিরকালের স্বভাব। ছোট মেয়ে অত শত বুঝ্‌তেননা, তিনি মনে কোর্‌তেন, ফুফু-আম্মা বুঝি তাঁকে তেমন ভালবাসেন না। তাই তিনি সব সময়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে দূরে সোরে থাক্‌তে চেষ্টা কোর্‌তেন। নূরজাহান যে এটা বুঝ্‌তেন না—তা' নয়। বালিকার ভাব-গতি বুঝে তিনি শুধু মনে মনে হাস্‌তেন।

এই ভাবে দিন কাট্‌ছিল। ক্রমে ক্রমে আর্জ্জেমন্দ বানু বড় হোয়ে উঠ্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূপও শতধারে উছ্‌লে উঠ্‌লো। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার কোর্‌লো, এক সম্রাজ্ঞী ছাড়া সারা হিন্দুস্থানে এ রূপের তুলনা মিলেনা। শাহজাদা খুর্‌রমের কাণে একথা উঠ্‌লো।

খুর্‌রম ছেলেবেলা থেকেই ভাবপ্রবণ ছিলেন। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবপ্রবণতা উদ্দাম প্রেমের আকারে দেখা দিল। আর্জ্জেমন্দ বানুর রূপের খ্যাতি যখন সারা দিল্লীতে ছড়িয়ে পোড়েছে, তখন হঠাৎ একদিন শাহজাদার খেয়াল হোল তাঁকে

একবার দেখ্‌বেন। অবশ্য দেখাটা কিছু শক্ত নয়। প্রায় সব সময়েই যখন তিনি বেগম মহলে থাকেন, তখন অতি সহজেই তাঁর দেখা মিল্‌তে পারে। হোলও তাই। খুর্‌রম গোপনে একদিন আর্জ্জেমন্দ-বান্নুকে দেখে নিলেন। দেখে বুঝলেন—সত্যই এ রূপের মত রূপ। বাদ্‌শাহের অন্দরমহল এ রূপের যোগ্য স্থান। তাঁর মন সকল দ্বিধা-সঙ্কোচ অতিক্রম কোরে আর্জ্জেমন্দ বান্নুকে পাবার জন্য ব্যাকুল হোয়ে উঠলো।

আর্জ্জেমন্দ বান্নু তখন পনের পার হোয়ে ষোলয় পা দিয়েছেন। কাজেই বিয়ের বয়স হোয়েছে। আসফ খাঁ বোন্‌কে ধোরে বোস্‌লেন, মেয়েকে যোগ্য পাত্রে বিয়ে দিতে হবে। নূরজাহান একটু চিন্তিত হোলেন।

এর পর থেকে তিনি ভাইঝিকে নিজের কাছে কাছে দৃষ্টির সীমার মধ্যে রাখ্‌তে লাগলেন। নিজের ইচ্ছামত মহলের যেখানে-সেখানে যেতে বা বেড়িয়ে বেড়াতে তাঁকে নিষেধ কোরে দিলেন। আর্জ্জেমন্দ

বান্নুর এতে যথেষ্ট অসুবিধা হোতে লাগ্‌লো বটে, কিন্তু কি কোরবেন—সম্রাজ্ঞীর হুকুম। উপায় কি ?

এদিকে খুর্‌রম অতিষ্ঠ হোয়ে উঠ্‌লেন। সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য, সেখানে আবেদন জানালে ক্ষতি বই লাভ হবেনা। কারণ, তিনি কিছুতেই ভাইঝিকে তাঁর হাতে সমর্পণ কোর্‌তে রাজী হবেন না। উপরন্তু তিনি জান্‌তে পারলে, আর্জ্জেমন্দবান্নু চিরদিনের জন্য হাতছাড়া হোয়ে যাবে। তিনি অন্যত্র তার বিয়ে দিয়ে খুর্‌রমের আশার স্বপ্ন ভেঙে দেবেন। এ অবস্থায় কি কোর-বেন, কিছু ঠিক কোরতে না পেরে শাহ্‌জাদা অস্থির হোয়ে উঠ্‌লেন।

মেয়ের বাপকে বোলেও কোন ফল নাই। কারণ, সম্রাজ্ঞীর হুকুম ছাড়া তিনি কোন কাজই কোরবেন না। তবে উপায় কি ?

শাহ্‌জাদা অনেক মাথা ঘামিয়ে শেষে স্থির কোরলেন, কোন রকমে একবার 'বান্নুর' সঙ্গে দেখা কোরবেন। তার অভিমত কি জেনে তারপর

চেষ্টা কোরবেন। যদি তার সম্মতি থাকে, তাহোলে কেউই এ বিয়ে রোধ কোর্‌তে পারবেনা, এই বিশ্বাস তাঁর মনে বদ্ধমুল হোল।

কিন্তু কাজের বেলায় এটা ঘোটে উঠ্‌লোনা। আর্জ্জেমন্দ বান্নু আর আগের মত স্বাধীন ভাবে মহলের যেখানে সেখানে বেড়াতে পারেন না, স্বয়ং সম্রাজ্ঞী তাঁকে চোখে চোখে রেখে দিয়েছেন। কাজেই শত চেষ্টা কোরেও খুর্‌রম তাঁর দেখা পেলেন না। শেষে নিরুপায় হোয়ে বিশ্বাসী বাঁদীর মারফতে তিনি নিজের মায়ের কাণে একথা তুল্‌লেন।

খুর্‌রমের মা বাদ্‌শাহের বেগম হোলেও প্রভাব প্রতিপত্তি তাঁর বিশেষ কিছুই ছিলনা। নূরজাহানই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। ঘরে বাইরে—সব জায়গাতেই। কাজেই ছেলের জেদের কথা শুনে তিনি ভাব্‌নায় পোড়ে গেলেন। বেগম নূরজাহান যে খুর্‌রমকে ভাল চোখে দেখেন না এবং এই আর্‌জী নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হোলে যে বিফল হোতে হবে, এটা

তিনি ভাল কোরেই বুঝ্‌তেন। কাজেই সে পথ না মাড়িয়ে তিনি সুযোগ বুঝে খোদ্ বাদ্‌শাহের কাছে গিয়ে আর্জ্জী পেশ কোরলেন। বাদ্‌শাহ কথাটা ভাল কোরে ভাব্‌লেন। তার পর বেগমকে আশ্বাস দিয়ে বিদায় দিলেন।

সময় মত বাদ্‌শাহ নূরজাহানের কাছে কথাটা পাড়্‌লেন। নূরজাহান হঠাৎ কোন জবাব দিলেন না। কয়েক দিনের সময় নিলেন।

নূরজাহানের সঙ্গে খুর্‌রমের মনোবাদ চোল্‌ছিল, খুর্‌রম সম্রাজ্ঞীর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব পছন্দ কোরতেন না, এই ছিল মনোবাদের কারণ। এখন নূরজাহান দেখ্‌লেন, এই সুযোগে যদি খুর্‌রমকে বশে আনা যায় মন্দ কি! এর পরেও কি সে আর বিরোধ কোরতে পারবে? একটা কৃতজ্ঞতা—অন্ততঃ চক্ষু লজ্জা ত আছে! তা' ছাড়া বিয়ের পর বান্থর প্রভাব ও খুর্‌রমের উপর পোড়্‌বে যথেষ্ট রকমে। তাতেও অনেক কাজ হবে। সম্রাজ্ঞী রাজী হোয়ে গেলেন।

শাহ্‌জাদা খুর্‌রম নূরজাহানের মনের কথা ধোর্‌তে পারলেন না। শুধু এইটুকু জান্‌লেন—এ বিয়েতে তিনি রাজী হোয়েছেন। এই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। এটুকুও তিনি আশা কোরতে পারেন নি।

শাহ্‌জাদার বুকের উপর থেকে ভাবনার বোঝা নেমে গেল। তিনি শুভদিনের অপেক্ষায় উৎসুক হোয়ে রইলেন।

বান্নুর বাপ আসফ খাঁও ঠিক এই রকমই একটা কিছু চাইছিলেন, এবং সেইজন্যই বোনের উপর মেয়ের ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হোয়ে বোসে ছিলেন। তাঁর আশা পূর্ণ হোল। সৌভাগ্যের গর্ব্বে ও আনন্দে তাঁর সারা বুক ভোরে উঠ্‌লো।

বাদ্‌শাহজাদার বিয়ে যেমন ভাবে হওয়া উচিৎ ঠিক তেমনি ভাবেই খুর্‌রম ও বান্নুর বিয়ে হোয়ে গেল। ফুলরাণীর মত ফুলহারে সেজে ফুলের চতুর্দ্দোলে আর্জ্জেমন্দবান্নু, শাহ্‌জাদা খুর্‌রমের মহলে এসে উঠ্‌লেন। ক'দিন ধোরে সমস্ত দিল্লী উৎসবে মেতে রইলো। ফুলের মালায়, আলোর ছটায়

বাঁশীর সুরে দিল্লী যেন রূপকথার রাজপুরীতে পরিণত হোল।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান নিজে উদ্যোগী হোয়ে সব কোরলেন। তাঁর হঠাৎ এতখানি পরিবর্ত্তন দেখে সকলেই আশ্চর্য্য হোয়ে গেল। কারণ, তিনি যে খুর্‌রমকে ভাল চোখে দেখেন না, একথা সকলেরই জানা ছিল। সেই খুর্‌রমের হাতে তুলে দিলেন কিনা নিজের ভাইঝিকে, তা-ও আবার নিজে উদ্যোগী হোয়ে এত খানি ঘটা কোরে! আশ্চর্য্য হবার কথা বৈ কি?

—দুই—

খুর্‌রম যা' আশা কোরেছিলেন, তার অতিরিক্ত পেয়ে গেলেন। তিনি দেখেছিলেন শুধু 'বানুর' রূপ এবং তাই দেখেই তিনি মুগ্ধ হোয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেনও শুধু রূপ, তার বেশী নয়। কিন্তু পেলেন তার অনেক বেশী। রূপের আড়ালে যে এতখানি গুণ থাকতে পারে, তা' শাহ্‌জাদার ধারণার অতীত ছিল। ছেলেবেলা থেকে রংমহলের মেয়েদের তিনি দেখে এসেছেন। তাদের রূপ-গুণ, আচার ব্যবহার—কিছুই তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু বানু আদৌ সে ধরণের মেয়ে

নন। তিনি যেন একেবারেই আলাদা। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তাঁর রূপে মহল আলো হয়, গুণে প্রাণ শীতল হয়। খুর্‌রমের জীবন সার্থক হোল।

সত্যই বান্নুর বাইরে যেমন অসাধারণ রূপ ছিল, ভিতরে গুণও ছিল তেমনি অলৌকিক। এই দুইয়ের সমন্বয়ে স্বামীকে তিনি একেবারে মুগ্ধ কোরে ফেল্‌লেন। মহলের মেয়েরা পর্য্যন্ত তাঁর বশীভূত হোয়ে পোড়লো। তাঁর মুখে যেন কি যাছু মাখানো আছে, কথায় যেন কি বশীকরণ মন্ত্র আছে, তাই যে একবার তাঁর সংসর্গে আসে, সে আর কখনও ভুল্‌তে পারে না। অল্পদিনের ভিতরেই সেই রেষারেষি দলাদলির রংমহলকে তিনি আপনার কোরে নিলেন।

এই ভাবে দিন কেটে চোল্‌লো। বান্নু নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বামীর সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন, তাঁর যেন আর আলাদা অস্তিত্ব রইল না। আর খুর্‌রম, তিনি বান্নু বোল্‌তে অজ্ঞান। তাঁর ধ্যান জ্ঞান

সমস্তই বান্নু। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে বান্নুই যেন তাঁর একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র আশ্রয়।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের চোখে কিন্তু ব্যাপারটা বড় ভাল ঠেক্‌লো না। বান্নুকে যে তিনি খুর্‌রমের হাতে দিয়েছিলেন, তার মূলে খুব বড় কারণ ছিল, সে কথা আমরা আগেই বোলেছি। এখন এই ভাবে বান্নু যদি নিজেকে হারিয়ে ফেলে, তাহোলে ত তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে না। বান্নু খুর্‌রমের উপর প্রভাব বিস্তার কোরে তাঁকে বিরোধের পথ থেকে ফিরিয়ে আন্‌বে। তাঁর (সম্রাজ্ঞীর) নির্দ্দেশ মান্‌তে বাধ্য কোরবে, এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য— কিন্তু অবস্থা যা' দাঁড়িয়েছে, তা'তে সে উদ্দেশ্য কোন দিন যে সিদ্ধ হবে, এমন আশা আদৌ করা যায় না। সম্রাজ্ঞী চিন্তিত হোয়ে পোড়্‌লেন।

কোন বিশেষ কাজে খুর্‌রম কয়েকদিনের জন্য রাজধানীর বাইরে চোলে গেলেন, সেই অবসরে সম্রাজ্ঞী বান্নুকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে তাঁকে আদর কোরে কাছে বসিয়ে নানা কথা

জিজ্ঞাসা কোর্‌তে লাগ্‌লেন, বান্নুও সরল ভাবে সকল কথার জবাব দিয়ে চোল্‌লেন।

এই সমস্ত কথাবার্ত্তার ভিতর মাঝে মাঝে সম্রাজ্ঞী চতুরতার সঙ্গে এমন দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা কোরতে লাগলেন, যাতে খুর্‌রমের মতি-গতির কিছু আভাস পাওয়া যায়। সরলা বান্নু অত শত বোঝেন না। তিনি যেমন-যেমন জানেন, তেমনি-তেমনি জবাব দিয়ে গেলেন।

সম্রাজ্ঞী বুঝ্‌লেন, এখনও পর্য্যন্ত খুর্‌রম প্রথম প্রেমের মোহে মশ্‌গুল হোয়ে আছেন। অন্য দিকে নজর দেবার বা অন্য কিছু করবার অবসর এখন তাঁর নেই। তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হোলেন।

এর পর তিনি বান্নুকে কয়েকটা মামুলী উপদেশ দিলেন। কারো সঙ্গে বেশী মেশামিশি না করা, মনের গোপন কথা কারো সঙ্গে না বলা. সব সময় রাশ ভারি রেখে চলা—এই সব বিষয়ে।

বান্নু কথাগুলো শুন্‌লেন মাত্র। আর কিছু নয়। কারণ, এ উপদেশমত চলা একেবারেই

তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। হাজার চেষ্টা কোরলেও কোন দিন তিনি এরকম ভাবে চোল্‌তে পারবেন না। কিন্তু একথা তিনি মুখে প্রকাশ কোরলেন না।

বিদায়কালে সম্রাজ্ঞী বিশেষ কোরে তাঁকে বোলে দিলেন, অবসর পেলেই যেন তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা কোর্‌তে আসেন। কারণ, তাঁকে অনেক কিছু শিখোবার এবং বুঝোবার আছে।

একে ফুফু-আম্মা তায় সম্রাজ্ঞী। বান্নু তাঁর আদেশ পালন না কোরে পারেন না। কাজেই এর পর থেকে সম্রাজ্ঞীর মহলে একটু ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ কোরে দিলেন।

এটা খুর্‌রমের দৃষ্টি এড়াল না। কাজটা তিনি আদৌ পছন্দ কোরলেন না। সম্রাজ্ঞীকে তিনি ভাল কোরেই জানেন। তাঁর বুদ্ধি, প্রতিভা, কৌশলের সীমা নাই। বান্নুর মত একটা সরলা মেয়ের উপর প্রভাব বিস্তার কোর্‌তে তাঁর বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। বিশেষ সে যখন ছেলেবেলা থেকে তাঁর স্নেহের সুত্রে বাঁধা। কিন্তু সরাসরি নিষেধ

কোরলে বান্নু যদি ব্যথা পায়, তাই সে ভিতরের রহস্য বুঝ্‌তে না পারে এমন ভাবে কথাটা তাকে বোল্লেন। তিনি বোল্লেন, বিশেষ জরুরী কাজ না হোলে নিজের মহল ছেড়ে কোথাও যেতে নেই বান্নু। এতে তোমার এবং আমার দু'জনেরই মর্য্যাদা হানি হয়।

কথাটা বান্নু সহজ ভাবেই গ্রহণ কোরলেন। এবং সম্রাজ্ঞীর কাছে যাওয়া পনের আনা রকম কমিয়ে দিলেন। এক-আধবার যা যেতে লাগলেন, তা-ও দায়ে পোড়ে,—ফুফু-আম্মা রাগ কোরবেন বোলে।

সম্রাজ্ঞী এটা লক্ষ্য কোরলেন। তিনি একদিন ভাইঝিকে জিজ্ঞাসা কোর্‌লেন। আজকাল আর তেমন আস্‌ছো না কেন বান্নু!

এ প্রশ্নে বান্নু একটু বিব্রত হোয়ে পোড়্‌লেন। কি উত্তর দেবেন তা ঠিক কোরে উঠ্‌তে পারলেন না। স্বামী যে মর্য্যাদা-হানির অজুহাত দেখিয়েছেন, সেটা ত সম্রাজ্ঞীর কাছে বলা চলে না, কাজেই তিনি নীরব রইলেন।

তাঁকে এই অবস্থায় দেখে নূরজাহানের সন্দেহ আরও বেড়ে উঠ্‌লো। তিনি আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরলেন।

এবার আর বান্নু উত্তর না দিয়ে পারলেন না। কিন্তু মিথ্যা কথা ত তিনি বোল্‌তে পারেন না, কাজেই যা সত্য, তাই প্রকাশ কোর্‌লেন। স্বামী যে কারণ দেখিয়ে তাঁকে নিষেধ কোরেছিলেন, সেই কারণেরই উল্লেখ কোর্‌লেন।

নূরজাহান শুনে হঠাৎ গম্ভীর হোয়ে গেলেন। খুর্‌রমের মনের কথা বুঝ্‌তে তাঁর দেরী হোল না। তিনি বেশ বুঝ্‌তে পারলেন, খুর্‌রম এতটুকু বদলাননি এবং বান্নু তাঁর উপর এদিক দিয়ে কোন প্রভাবই বিস্তার কোরতে পারেনি।

যাহোক, বান্নুর কাছে তিনি কিছুই প্রকাশ কোরলেন না। এর পর এ-প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে অন্য মামুলী কথাবার্ত্তা আরম্ভ কোরলেন।

কিছু বুঝ্‌তে না পার্‌লেও সম্রাজ্ঞীর হাব-ভাব দেখে বান্নুর মনে কেমন-যেন একটা খট্‌কা লেগে

গেল, এবং সেই খট্‌কা নিয়েই তিনি নিজের মহলে ফিরে এলেন।

সুযোগ বুঝে তিনি স্বামীকে বোল্‌লেন, যাতায়াত বন্ধ করার দরুণ ফুফু-আম্মা রাগ কোরেছেন।

খুর্‌রম আগে থেকেই এটা অনুমান কোরে রেখেছিলেন। কাজেই আদৌ আশ্চর্য্য হোলেন না। শুধু বোল্‌লেন, তা' কোরলে আর কি কোরবো। তাঁর যেমন একটা মর্য্যাদা আছে, তেমনি আমাদের ও ত একটা মর্য্যাদা আছে। তবে তাঁর মর্য্যাদা না হয় বড় আর আমাদের না হয় ছোট। তবু মর্য্যাদা ত বটে!

খুর্‌রম ভিতরের কথা কিছু ভাঙলেন না। গুরু-তর রাজনীতি সম্পর্কে কোন কথাই তিনি বান্নুর কাছে প্রকাশ করেন না। কারণ, বান্নু ওসব কিছুই বোঝেন না।

এদিকে বান্নুর কথায় নূরজাহানকে কে যেন খোঁচা মেরে জাগিয়ে দিল। বান্নুর বিয়ে দিয়ে তিনি যেন একটা নিশ্চিন্ত তন্দ্রার আবেশে মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ

সে তন্দ্রা ছুটে গেল। জামাই শাহরিয়ারকে ভবিষ্যতে দিল্লীর সিংহাসনে বসাবার জন্য যে তোড়জোড় তিনি আরম্ভ কোরেছিলেন, এইবার সেটাকে কাজে লাগাবার জন্য উঠে পোড়ে লাগলেন।

খুর্‌রম বিদ্রোহী হোলেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা—সম্রাজ্ঞীর এ আয়োজন যেমন কোরে হোক তিনি পণ্ড কোরবেন। এই বিরোধে বানু মনে মনে ব্যথা পেলন এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্রাজ্ঞী কেন তাঁকে ঘন ঘন নিজের কাছে যেতে বোল্‌তেন এবং স্বামীই বা কেন তাতে বাধা দিতেন, কথাটা বুঝ্‌তে পারলেন। তিনি একদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা কোরলেন বিবাদটা মিটিয়ে ফেল্লে ভাল হয় না কি ?

এতে স্বামী যে উত্তর দিলেন, তার উপর আর বানু কথা কইতে পারলেন না। খুর্‌রম তাঁকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, সম্রাজ্ঞী সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব নিয়ে নিজের যা' খুসী তাই কোচ্ছেন। আমাদের সকলকে বঞ্চিত কোরে শাহরিয়ারকে সিংহাসনে বসাবেন, এই হোচ্ছে তাঁর মতলব। কেন, আমরা কি বানের

পানিতে ভেসে এসেছি? আমরা কি বাদ্‌শার ছেলে নই?

এর পর বান্নু আর কি বোলবেন? স্বামী যা বলেন বা করেন, না বুঝ্‌তে পারলেও সেইটাকেই তিনি ভাল বোলে মেনে নেন। স্বামীর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। স্বামীর ভালয় তাঁর ভালো। কাজেই তাঁর কথার উপর তিনি কোন দিন কথা বলেন না, আজও বোল্লেন না। শুধু মনে মনে একবার বোল্‌লেন, আমার ত সিংহাসনের কোন প্রয়োজন নাই, তুমিই আমার সিংহাসন, তুমিই আমার সাম্রাজ্য, তুমিই আমার সব। তবে তুমি যদি চাও— নাও। আমার বলবার বা করবার কিছু নেই।

এর পর থেকে বান্নু এ সম্বন্ধে স্বামীকে আর কোন কথাই বোল্‌তেন না। কারণ, তিনি জান্‌তেন, এ বিষয়ে তিনি একেবারেই কিছু জানেন না। তিনি জানেন শুধু মমতা, স্নেহ সেবা, আর কিছু নয়।

———

—তিন—

খুর্‌রমের সঙ্গে সম্রাজ্ঞীর ঘোর বিরোধ উপস্থিত হোল। তিনি চান সম্রাজ্ঞীর সর্ব্বময় কর্তৃত্ব লোপ কোরতে আর সম্রাজ্ঞী চান তাঁকে দমন কোরে নিজের বশে আন্‌তে। এ বিরোধ কিছুতেই মিট্‌লোনা। ক্রমাগত বহু বৎসর ধোরে এই বিবাদ চোল্‌লো। বানু কোন পক্ষেই কোন কথা বোল্‌লেন না। তিনি রইলেন তাঁর নারী-ধর্ম্ম নিয়ে। একান্ত ভাবে স্নেহ মমতা ও সেবা-শুশ্রূষার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে।

এর মধ্যে বান্থর সন্তান-সন্ততি হোল কয়েকটী। সকলের চেয়ে যে-টী বড়, সেটী হোল মেয়ে। আদর কোরে বান্থ মেয়ের নাম রাখ্‌লেন জাহানারা। জাহানারা মায়ের মতই স্থন্দরী হোয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের গুণপণাও যা'তে লাভ কোরতে পারে, খুর্‌রম সেই ভাবেই তাকে গোড়ে তুলতে লাগ্‌লেন।

আগেই বোলেছি, খুর্‌রমের সিংহাসনের উপর বিশেষ ঝোঁক ছিল। বাদ্‌শাহ জাহাঙ্গীরের পর তিনি হিন্দুস্থানের সিংহাসনে বোস্‌বেন, এ আশা তাঁর মনে খুব প্রবল ছিল। কিন্তু বিঘ্নও ছিল অনেক। সব-চেয়ে বড় বিঘ্ন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, তার পর শাহজাদা খসরু। খসরু বাদ্‌শার বড় ছেলে, কাজেই ন্যায়-ধর্ম্ম মতে ভবিষ্যতে হিন্দুস্থানের সিংহাসন তাঁরই প্রাপ্য ছিল। এই তুইটী প্রবল বাধা অতিক্রম কোরে তাঁকে সিংহাসন অধিকার কোরতে হবে এবং সেই চেষ্টাই তিনি এ যাবৎ কোরে আস্‌ছিলেন।

একাজে দৈব তাঁর সহায় হোল। হঠাৎ শাহ্‌জাদা খসরুর মৃত্যু হোল। খুর্‌রমের সিংহাসন লাভের পথ অনেকখানি পরিষ্কার হোয়ে এল। বাকী রইলেন একমাত্র সম্রাজ্ঞী। তাঁর ষড়যন্ত্র ভেঙে দেবার জন্য এইবার খুর্‌রম উঠে পোড়ে লাগ্‌লেন। তিনি বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ আরম্ভ কোরে দিলেন। শেষ পর্য্যন্ত প্রধান সেনাপতি মহাবৎ খাঁকেও দলে টেনে নিলেন।

এদিকে বাদ্‌শার শরীর খুব বেশী রকম ভেঙে পোড়েছিল। অধিক দিন বাঁচবার আশা ছিল না। তার উপর পুত্রশোক পেয়ে তিনি একেবারে মুশ্‌ড়ে পোড়লেন। শেষ সময়ে তিনি অনেক চেষ্টা কোরলেন, এই ঘরোয়া বিবাদ মিটোবার জন্য। কিন্তু পেরে উঠ্‌লেন না। সম্রাজ্ঞীর ধনুক-ভাঙা পণ—জামাই শাহ্‌রিয়ারকে যেমন কোরে হোক সিংহাসনে বসাবেন। খুর্‌রমেরও প্রাণপণ তিনি কিছুতেই তা কোর্‌তে দেবেন না। নিজেই সিংহাসন দখল কোরে বোস্‌বেন।

অনেক চেষ্টা কোরে বাদ্‌শাহ যখন দেখ্‌লেন, এ বিরোধ মেট্‌বার নয়, তখন তিনি একান্ত ভাবে হতাশ হোয়ে পোড়লেন। একে ভাঙা শরীর, তায় পুত্রশোক, তার উপর আবার এই নৈরাশ্য। কিছু-দিন পরেই তাঁকে বিছানা নিতে হোল।

এর পর আর তিনি উঠ্‌তে পারলেন না। অল্পকাল পরেই সাম্রাজ্য, সিংহাসন, ধনরত্ন মণি-মাণিক্য আত্মীয় স্বজন সবের মায়া কাটিয়ে তিনি পরলোকের পথের যাত্রী হোলেন। সারা হিন্দুস্থানে হাহাকার জেগে উঠ্‌লো।

———

—চার—

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান খুর্‌রমের সিংহাসন লাভের পথ কিছুতেই আট্‌কাতে পারলেন না। তাঁর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হোল। খুর্‌রম শাহজাহান নাম নিয়ে আসমুদ্র হিন্দুস্থানের বাদ্‌শাহী দখল কোরে বোস্‌লেন। আর আর্জ্জেমন্দ বানু মমতাজমহল নাম নিয়ে সম্রাজ্ঞী রূপে তাঁর পাশে এসে বোস্‌লেন।

সিংহাসনে বোসেই শাহজাহান বাৎসরিক বহু টাকা বৃত্তি দিয়ে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে লাহোরে পাঠিয়ে দিলেন। দিল্লীতে থাকলে অনেকেই তাঁর

প্রভাবে চালিত হবে এবং তার ফলে বাদ্‌শার সাম্রাজ্য-শাসনে অনেক বিঘ্ন ঘোট্‌বে, এই জন্যই এ রকম ব্যবস্থা করা হোল।

শাহজাহান অন্তরে-অন্তরে কবি ছিলেন, প্রেমিক ছিলেন। আর সে কবিত্ব. সে প্রেম পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছিল মমতাজের সংস্পর্শে। তিনি স্বামীর অন্তরের এই দুইটী গোপন জিনিষকে তাঁর অজ্ঞাতসারে অপরূপ রূপে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, —তাঁর সৌন্দর্য্যে, স্নেহে, মমতায় ও সেবায়। কিন্তু বাইরের জগৎ এতকাল সেটা জান্‌তে পারেনি। কারণ, এতকাল শাহজাহান সংগ্রাম কোরেই জীবনটা কাটিয়ে এসেছিলেন, রাজনীতির পঙ্কিল আবর্জ্জনার ভিতর নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। জানাবার সুযোগ বা অবসর তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। এখন নিশ্চিন্তে সিংহাসনে বোসে সেই আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য্য ও প্রেমেব সাধনায় তিনি নিমগ্ন হোলেন। জীবন-সঙ্গিনী মমতাজ এতদিনে সহায় রূপে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। স্ত্রী, স্বামীর সকল কাজের

সহায়, সকল ক্ষেত্রের সঙ্গিনী। কিন্তু এতকাল পর্য্যন্ত মমতাজ স্বামীর কোন কাজেরই সহায় বা সঙ্গিনী হোতে পারেন নি। যুদ্ধ-বিগ্রহ বা রাজ-নীতিতে অংশ গ্রহণ তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কাজেই তা' হোয়ে উঠেনি। এখন সে সব চুকে গিয়েছে। তাই তিনি স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, যা-কিছু সুন্দর, যা কিছু কবিত্বময় তারই সৃষ্টির পরিকল্পনায় তাঁকে সাহায্য কোর্‌তে। কিছুদিনের মধ্যেই রাজধানীর শ্রী ফিরে গেল —মনোরম সৌধ-শোভায়—কারু-কার্য্যে—শিল্প-কলায়।

কিছুদিন পরে শাহজাহান দিল্লী থেকে আগ্রায় রাজধানী তুলে নিয়ে এলেন। আগ্রা তাঁর বড় প্রিয় ছিল। মনের মত কোরে তাকে সাজাবেন বোলে তিনি এই অদল বদল কোরলেন।

প্রথমেই তিনি মোগল বাদশাহদের শান্-শওকতের উপযোগী একটা সিংহাসন তৈরী কোরতে মনস্থ কোরলেন। মনে মনে একটা

পরিকল্পনাও কোরলেন। কিন্তু ঠিক মনের মত হোল না। তিনি মমতাজের সাহায্য চাইলেন। কারণ, এসব বিষয়ে মমতাজ ওস্তাদ ছিলেন বোল্লেই হয়। কারু-শিল্পে বা সুন্দর পরিকল্পনায় সে যুগে হিন্দুস্থানে তাঁর জোড়া ছিল না।

মমতাজ সিংহাসনের পরিকল্পনা কোরলেন, সুন্দর পরিল্পনা। শাহজাহান মুগ্ধ হোয়ে গেলেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারেই তিনি সিংহাসন গোড়্তে দিলেন—দূর দূরান্তর থেকে শিল্পী আনিয়ে।

এর পর থেকে প্রত্যেক কাজেই শাহ্জাহান মমতাজের পরামর্শ নিতেন। না নিলে যেন তাঁর মনের খুঁৎ খুঁৎ ভাব ঘুচ্তোনা।

একদিন গভীর রাত্রিতে স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা হোচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ কি মনে কোরে মমতাজ বোলে উঠ্লেন, তোমার আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহোলে কি কোরবে?

কথাটায় শাহজাহানের মনে গভীর বেদনা বেজে উঠলো। তিনি অনেকক্ষণ চুপ কোরে রইলেন,

তারপর বোল্লেন, এমন একটা কিছু কোরবো, যাতে অনন্তকাল ধোরে দুনিয়া তোমাকে স্মরণ করে।

উত্তর শুনে মমতাজ একটা গভীর তৃপ্তি অনুভব কোরলেন।

মমতাজের অন্তরের অন্তর থেকে এ প্রশ্ন উঠে-ছিল। বুঝি তিনি ভবিষ্যৎ বুঝ্তে পেরেছিলেন। তাই স্বামীর মনের কথা জেনে নেবার জন্য এই প্রশ্ন তুলেছিলেন।

শিল্পীরা রাত্রিদিন খেটে মমতাজের পরিকল্পনা অনুসারে সিংহাসন তৈরী কোরে দিল। দেখে মমতাজ ও শাহজাহান উভয়েই পরম খুসী হোলেন। মমতাজ সিংহাসনের নাম দিলেন ময়ূর সিংহাসন। এই ময়ূর সিংহাসনের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সোনার অক্ষরে লেখা আছে। দুনিয়ার কোন দেশের কোন রাজাই আজ পর্য্যন্ত এমন একখানি সিংহাসন তৈরী কোরতে পারেননি।

মানুষের জীবন কখনও নিরবচ্ছিন্ন সুখের হয়না। শাহজাহান-মমতাজেরও হোল না। নির্ম্মম কাল তাঁদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। শাহজাহানের বুক থেকে মমতাজকে কঠোর হস্তে ছিনিয়ে নিল। হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে গেল। তাঁর সমস্ত জীবন হাহাকারে ভোরে উঠ্‌লো।

মমতাজ গর্ভবতী ছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হোল।

মমতাজের মৃত্যুর পর শাহজাহান যেন আর সে শাহজাহান রইলেন না। একদিনে তাঁর যৌবন যেন কোথায় চোলে গেল। বার্দ্ধক্য তাঁর সমস্ত দেহ-মন অধিকার কোরে বোস্‌লো।

যমুনার তীরে উপযুক্ত সমারোহের সঙ্গে বেগম মমতাজমহলের সমাধি হোল।

এতদিন পরে শাহজাহানের সেই কথা মনে পোড়্‌লো। তিনি মমতাজকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর এমন একটা কিছু কোরবেন, যা'তে অনন্তকাল ধোরে দুনিয়া তাঁকে

স্মরণ করে। এইবার সেই প্রতিশ্রুতি পালনের সময় এল।

দিন রাত্রি ধোরে তন্ময় হোয়ে চিন্তা কোরে তিনি স্থির কোরলেন, মমতাজের সমাধির উপর এক অপূর্ব্ব স্মৃতি-সৌধ গোড়ে তুল্‌বেন, যার সৌন্দর্য্যে, শিল্পে, দুনিয়ার সমস্ত বিখ্যাত সৌধের সৌন্দর্য্য ও শিল্পকলা ম্লান হোয়ে যাবে।

শাহজাহান ধ্যানস্থ যোগীর মত তার পরিকল্পনায় বোস্‌লেন।

যখন পরিকল্পনা শেষ হোল, তখন দেশ দেশান্তর থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আহ্বান কোরলেন, মমতাজের স্মৃতির অমর নিদর্শন গোড়ে তোলবার জন্য। ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার মুক্ত কোরে দূর দূরান্তর থেকে মূল্যবান পাথর, মণিমুক্তা, মরকত কিনে আনা হোল, তার অঙ্গে অঙ্গে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের অম্লান বর্ণচ্ছটা ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্য।

বছরের পর বছর ধোরে কোটী কোটী টাকা ব্যয় হোল। তার পর যমুনার তীরে গোড়ে

উঠ্‌লো—মমতাজের স্মৃতির অপূর্ব্ব সুন্দর অমর নিদর্শন—তাজমহল। শাহজাহান বাদ্‌শার বিরহের অশ্রু মর্ম্মর পাথরে মূর্ত্তি ধোরে ফুটে উঠ্‌লো। তাঁর অন্তরের গোপন প্রেম চিরন্তন শুভ্র মহিমায় দুনিয়ার বুকে রূপ নিল। মানুষ অবাক হোয়ে তাকিয়ে রইল।

আজও তাজমহল দুনিয়ার বুকে বিরহের অমর প্রতীক রূপে দাঁড়িয়ে আছে। আজও যমুনা তার পায়ের তলে করুণার কাতর কাঁদন জাগিয়ে তোলে। আজও তার চার পাশ ঘিরে বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাসে নীরব হাহাকার জেগে ওঠে।

মমতাজ নাই, শাহজাহান নাই। আছে তাজ। প্রেমের—বিরহের স্মৃতির অমর নিদর্শন। অটুট অব্যয়—শাশ্বত—সুন্দর—চিরন্তন।

"দিল্লীশ্বরী" সম্বন্ধে কয়েকটী অভিমত।

মুস্‌লিম বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক "মোহাম্মদী" বলেন :—

"......দিল্লীশ্বরী ঐতিহাসিক জীবনী গ্রন্থ।......সাহিত্য-রসিক পাঠকগণ বইখানি পড়িয়া খুব খুশী হইবেন বলিয়াই আমরা মনে করি। ইতিহাসের দিক দিয়া ইহাতে কোন ত্রুটী বিচ্যুতি আছে কিনা, ইতিহাস-বিশেষজ্ঞগণেরই বিচার্য্য। আমাদের বিবেচনায়, সাহিত্য হিসাবে বইখানার মূল্য ইহার ঐতিহাসিক মূল্যের চাইতেও বেশী। ইহার ভাষা সরল সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বইখানার ছাপা কাগজ, গেট্‌-আপও মনোহর। কয়েকখানা সুন্দর চিত্র সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থকার ইহার সৌন্দর্য্য-সম্পদ আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। গ্রন্থের তুলনায় ইহার পাঁচসিকা মূল্য কম হইয়াছে বলিয়াই মনে হইল। এই সুন্দর জীবনী-গ্রন্থখানার বহুল প্রচার সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।"

বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক "হানাফি" বলেন :—

"......দিল্লীশ্বরী—একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। সোলতানা রাজিয়া, চাঁদ সোলতানা, নুরজাহান ও মমতাজ মহলের জীবন কথা লইয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। মূলতঃ গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক হইলেও সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থের ন্যায় ইহা কতকগুলি নীরস তথ্যের সমাবেশ নহে। মধুর প্রাঞ্জল এবং কবিত্বময়ী ভাষায় ইতিহাসের শুষ্ক নীরস তথ্যগুলিকে এই গ্রন্থের মধ্যে অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইতিহাসের মধ্য দিয়া সর্ব্বথা অক্ষুন্ন অথচ উপন্যাসের ন্যায় সরল ও সুখপাঠ্য, গ্রন্থকারের পক্ষে উহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। আমাদের মনে হয়

"দিল্লীশ্বরী" ইতিহাস ও সাহিত্য এই দুই দিক দিয়াই পাঠক সমাজের মনোরঞ্জন করিবে। গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

বঙ্গদেশের অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাপ্তাহিক "নয়া-বাংলা" বলেন :—

"……বইখানি শিশুদের জন্য লিখিত। খুব পাকা হাত না হইলে শিশু-সাহিত্য বিশেষ করিয়া ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করা আদৌ সম্ভব নহে। লেখকের হাত বেশ। পাকা এই ঐতিহাসিক গ্রন্থখানি ঐ শ্রেণীর ত্রুটী বিচ্যুতি হইতে মুক্ত। গ্রন্থকার এমন সুন্দর মধুর ও প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন যে শিশুরা এ পুস্তক পাঠে যথেষ্ট আনন্দলাভ করিবে এবং উপকৃত হইবে। এই হিসাবে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শিশুদের মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ ও চরিত্র গঠনের জন্য এই শ্রেণীর পুস্তকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমরা আলোচ্য পুস্তকটীর বহুল প্রচার কামনা করি। পুস্তকখানির ছাপা কাগজ ও বাঁধাই উত্তম।